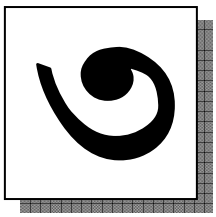

সম্রাট আকবর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত (১৫৫৬ খ্রি.) হবার পর থেকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করে। এ সময় থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য সীমানা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে মুঘল সম্রাট আকবর ও আওরঙ্গজেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সম্রাটগণ সাম্রাজ্যের সংহতি দৃঢ়ীকরণ, প্রশাসনিক উন্নতি সাধন এবং বিভিন্ন জনহিতকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে মধ্যযুগের ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। সম্রাটগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুঘল ভারতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। এসঙ্গে শিল্প সাহিত্যের প্রভুত উন্নতি ঘটে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়। এসব সত্ত্বেও পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।আলোচ্য ইউনিটে সম্রাট আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত মুঘল সম্রাটগণের রাজ্যবিস্তার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রশাসন ব্যবস্থা, ভূমি রাজস্বনীতি, ধর্মীয় নীতি, জনহিতকর কার্যাবলি, শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব, মুঘল যুগে ভারতের প্রশাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ প্রভৃতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। 'মুঘল শাসন' শীর্ষক এই ইউনিটকে নিম্নোক্ত ৮টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

পাঠ - ১

মহামতি আকবর ঃ সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আকবরের সিংহাসন আরোহণকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *দিল্লি-আগ্রা পুনরুদ্ধারের জন্য আকবর ও আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর সঙ্গে সংঘটিত পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি এবং আকবর কর্তৃক শাসন ভারত স্বহস্তে গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *উত্তর-ভারতে রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;*
- *বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে আকবরের রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস বলতে পারবেন;*
- *দক্ষিণ ভারতে আকবর কিভাবে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেছিলেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়ীকরণে আকবরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।*

বাবুরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা হলেও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহামতি আকবর। বাবুর মুঘল সাম্রাজ্যের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন হুমায়ুনের শাসনকালে তা ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। আকবর সে লুপ্ত ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে যুদ্ধ কৌশলে নয়, রাজকীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন বিভাগে এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার গুণে তিনি ভারতের ইতিহাসে যে অবিস্মরণীয় প্রভাব রেখে গেছেন সেজন্য তাঁর 'মহামতি' আখ্যা যথার্থ। ঐতিহাসিক ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, "শুধুমাত্র ভারত ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে আকবর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।"

পিতা হুমায়ুন যখন শেরশাহের হস্তে রাজ্যচ্যুত হয়ে এবং ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত অমরকোটের রাণা প্রসাদের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন (১৫ অক্টোবর, ১৫৪২) আকবরের জন্ম হয়। রাণা প্রসাদের সহযোগিতায় হুমায়ুন যখন থাট্টা ও ভাক্কার অভিযানে অগ্রসর হন পথিমধ্যে তার্দি বেগ খান কর্তৃক হুমায়ুন পুত্রের জন্ম সংবাদ পান। হুমায়ুনের তখন এমনই দুঃসময় চলছিল, যার জন্য তাঁর পুত্রের

জন্মের সংবাদে কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা কিংবা তাঁর সঙ্গীদের কোন পুরস্কার দিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন। তখন তিনি একটি কস্তুরী কেটে সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করে বলেন, 'আমার আজ আপনাদের দেওয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই কস্তুরীর সুগন্ধ যেমন তাবুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, একদিন আমার পুত্রের যশ ও খ্যাতিও এই কস্তুরীর সুগন্ধের মতো সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত হবে।' উল্লেখ্য, আকবর সিংহাসনে বসে পিতার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন। তাঁর যশ ও খ্যাতি শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

হুমায়ুন হৃতরাজ্যের একাংশ পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুবরণ (২৭ জানুয়ারি, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ) করেন। তখন আকবরের বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর। আকবর তখন পাঞ্জাবে সিকান্দার শূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।এই সংবাদ পেয়ে হুমায়ুনের বন্ধু ও অনুচর আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ তৎক্ষণাৎ ইটের মঞ্চ তৈরি করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬, সেই ইটের মঞ্চে আকবরের সিংহাসন আরোহণের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্বভাবতই তের বছরের বালক আকবর শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। তাই বৈরাম খান তাঁর পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

আকবরের সিংহাসন আরোহণকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মুঘল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।এ সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সংকট তীব্রভাবে ঘনীভূত হয়েছিল এবং চারদিকে বিশৃঙ্খলার দরুন বালক আকবর চরম সংকটে পতিত হন। শের শাহের উত্তরাধিকারীর সময় থেকে ভারতে বহু স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। হুমায়ুন সাম্রাজ্যের অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠা করতে পারলেও সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার সময় পাননি। এ সময়ে দিল্লির সিংহাসনের প্রতি তিন জন নরপতির লোলুদ্ধ দৃষ্টি ছিল।

প্রথমত, শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহের সেনাপতি হিমু দিল্লির সার্বভৌম ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর হন।

দ্বিতীয়ত, শের শাহের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সিকান্দার শূর পাঞ্জাব থেকে দিল্লির সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করে আকবরের সিংহাসন দাবিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত ছিলেন।

তৃতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা মোহাম্মদ হাকিম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। তিনিও আকবরের সিংহাসনের দাবিকে বিনষ্ট করে নিজের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন।

এ সময়ে স্থানীয় এক মুসলমান বংশ কাশ্মীর শাসন করছিল। শেরশাহের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলেই সিন্ধু ও মুলতান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। বাংলায় শাসন করছিল শূর বংশীয়রা। ইব্রাহিম খাঁ শূরের দ্বারা দিল্লি থেকে বিতাড়িত হয়ে আদিল শাহ আগ্রা থেকে মালব পর্যন্ত অঞ্চল শাসন করছিলেন। দিল্লির পশ্চিম অঞ্চলে রাজপুতনায় মেবার, জয়শল্মীর, যোধপুর, বুঁদি প্রভৃতি রাজ্যের রাজপুত নরপতিগণ স্বাধীনভাবে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের বিরোধিতা কোনমতেই আকবরের পক্ষে উপেক্ষনীয় ছিল না। তদুপরি গুজরাট, মালব, উড়িষ্যা প্রভৃতি দিল্লির প্রাধান্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। দক্ষিণ-ভারতের খান্দেশ, বেরার, বিদর, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা স্বাধীন নরপতিদের অধীনে শাসিত হচ্ছিল। তাছাড়া পর্তুগিজগণ গোয়া ও দিউ দখল করে পশ্চিম উপকূলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এমন কি এদের উপদ্রবে মক্কা যাত্রী মুসলমানগণ নিরাপদে সাগর পাড়ি দিতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে আকবরের সিংহাসন আরোহণের প্রাক্কালে ভারত শতধা বিচ্ছিন্ন ছিল।

উপরন্তু, শেরশাহের উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসনের ফলে ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে।এসঙ্গে ভারতের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দিল্লি ও আগ্রাতেই হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। সমকালীন ঐতিহাসিকগণ এই দুর্ভিক্ষকে 'আদিল শাহ দুর্ভিক্ষ' নামে অভিহিত করেছিলেন। এসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মহামারী ও প্লেগ।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬ খ্রি.

হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে আকবর সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে আদিল শাহের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি হিমু দিল্লি ও আগ্রা দখল করে ভারতবর্ষ থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করার জন্য অগ্রসর হন। আগ্রার মুঘল শাসনকর্তা ইস্কান্দার খান তাঁকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়ে দিল্লিতে পালিয়ে আসেন। হিমু আগ্রা দখল করে আগ্রা থেকে দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। দিল্লির শাসনকর্তা তার্দি বেগ হিমুর হামলা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনিও দিল্লি থেকে পালিয়ে পাঞ্জাবে চলে আসেন। অতপর হিমু আদিল শাহের অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মুঘল সেনাবাহিনীর নৈতিক শক্তি ও মর্যাদায় আঘাত হানে। পাঞ্জাবে অবস্থানরত আকবরের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে অধিকাংশ অভিজাত তাঁকে হিমুর কাছ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কাবুলে চলে যেতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আকবরের অভিভাবক বিচক্ষণ রাজনীতিক বৈরাম খাঁ ঐসব পরাজয়প্রবণ অভিজাতগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তিনি বিনা যুদ্ধে হিমুকে দিল্লির সিংহাসন ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। বালক সম্রাট আকবর বৈরাম খাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাবুলে পালিয়ে না গিয়ে হিমুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মুঘলদের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। অতপর সিকান্দার শূরকে দমন করার জন্য আকবর খিজির খানকে পাঞ্জাবে রেখে বৈরাম খাঁ সহ দিল্লি অধিকারের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে সিরহিন্দে আগ্রার পলাতক শাসনকর্তা ইস্কান্দার খান ও দিল্লির পলাতক শাসনকর্তা তার্দি বেগ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। দিল্লি রক্ষা করতে না পারার অপরাধে বৈরাম খাঁ তার্দি বেগকে হত্যা করেন। কর্তব্যে অবহেলা ও কাপুরুষতার ফলস্বরূপ তাঁর এই পরিণতি হয়।

সিরহিন্দ থেকে আকবর ও বৈরাম খাঁ তাঁদের প্রধান শত্রু দিল্লি ও আগ্রা দখলকারী হিমুকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকারের সংকল্প নিয়ে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতিহাসখ্যাত পানিপথের প্রান্তরে মুঘল সৈন্যবাহিনীকে হিমু বাধা প্রদান করলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে হিমুর আফগান সৈন্যবাহিনী মুঘল সৈন্যবাহিনীকে স্থানচ্যুত করলে মুঘল সৈন্যবাহিনী ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ হিমুর দক্ষিণ চক্ষু তীরবিদ্ধ হলে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ফলে নেতৃত্বের অভাবে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং হিমুর আফগান সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে থাকে। হিমু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধৃত হন। অতপর বন্দি অবস্থায় তাঁকে আকবরের নিকট আনা হয়। বৈরাম খাঁ আকবরকে হিমুর শিরচ্ছেদ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু আকবর এতে অসম্মতি জানালে বৈরাম খাঁ নিজে হিমুর শিরচ্ছেদ করেন। আকবর বিজয়ীবেশে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর দিল্লি প্রবেশ করেন। কালবিলম্ব না করে তিনি আগ্রা অধিকার করেন এবং সিকান্দার শূরের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে সিকান্দার শূর ১৫৫৭ খ্রি. বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। আকবর তাঁকে বিহারে জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সিকান্দার শূর বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তাঁকে জায়গীর চ্যুত করা হয়। তিনি আত্মরক্ষার্থে বাংলায় আশ্রয় নেন। বাংলায় অবস্থানকালে ১৫৫৯ খ্রি. তাঁর মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে ইব্রাহিম শূর মুঘল বিরোধিতা ত্যাগ করেন এবং আদিল শূর বাংলা অধিকারের বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে ইতোমধ্যে (১৫৫৬) নিহত হন। ফলে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা আকবরের নিকট দাবি করার মতো আর কোন প্রবল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। ১৫২৬ খ্রি. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর বাবুর যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, ১৫৫৬ খ্রি. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবরের জয়লাভের ফলে সেই সাম্রাজ্য বিপদমুক্ত হয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর আফগানগণ আর কখনো সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পানিপথের

জয়লাভই আকবরের এবং ভারতবর্ষে মুঘল ভাগ্য নির্ধারণ করে। এরপর থেকে মুঘলদের নতুন শক্তিতে যাত্রা শুরু হয়। এসব দিক বিবেচনা করলে সত্যিই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ আকবর ও বৈরাম খাঁর অত্যন্ত বিবেচনাপ্রসূত ও সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। উপরন্তু বাবুরের সময়ে যে মুঘল-আফগান সংঘাতের সূচনা হয়েছিল, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে এর অবসান ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধকে আকবর তথা মুঘলদের সর্বশেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ বলা যায়। এরপর আকবর যেসব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেসব ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ। মূলত মুঘলদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সীমা-মীমাংসমূলক যুদ্ধ ছিল পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি ও সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ

সিংহাসনে অধিষ্ঠানের পর প্রথম চার বৎসর (১৫৫৬-১৫৬০ খ্রি.) বালক আকবর নামে মাত্র শাসক ছিলেন। এই সময়ে তাঁর অভিভাবক পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁ মূলত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা বালক আকবরকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যকে সকল ক্ষেত্রে বিপদমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পানিপথের যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আজমীর, গোয়ালিয়র, জৌনপুর প্রভৃতি অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আকবর বৈরাম খাঁর নিকট নানাভাবে ঋণী। কিন্তু বালক আকবরের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন অন্যদিকে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা তাঁর আচার-আচরণে প্রকাশ পেলেও বৈরাম খাঁ তা উপলব্ধি করতে পারেননি। তাছাড়া বৈরাম খাঁ রাজক্ষমতা হাতে পেয়ে পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা লিপ্সু ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এসব কর্মকান্ডে আকবর ক্রমে তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আকবরও নামে মাত্র সম্রাট না থেকে কার্যত সম্রাট হতে আগ্রহী হন।

তাছাড়া আকবরের মাতা হামিদা বানু, ধাত্রী মাতা মাহম্ অন্গ এবং অপরাপর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন বৈরাম খাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আকবরকে তাঁর অভিভাবকের কর্তৃত্ব বর্জন করতে উপদেশ দেন। ক্রমে আকবরও বৈরাম খাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠেন। ফলে ১৫৬০ খ্রি. আকবর বৈরাম খাঁকে অভিভাবকত্ব থেকে অপসারিত করেন এবং স্বহস্তে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার

১৫৬০ খ্রি. আকবর ব্যক্তিগত শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ফলে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আকবর তাঁর রাজত্বের সূচনা হতে মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ১৫৬১ খ্রি. আকবর যে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির সূত্রপাত করেন ১৬০১ খ্রি. খান্দেশের আসিরগড় দুর্গ অধিকার পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর স্থায়ী ধারাবাহিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে আকবর সমগ্র উত্তর ভারতে এবং মধ্য ভারতে ঐক্য স্থাপন করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। এ ব্যাপারে আবুল ফজল বলেন, "ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অত্যাচারী ও স্বার্থান্বেষী শাসকদের শাসন থেকে জনসাধারণকে শান্তি ও সমৃদ্ধিদানের জন্য আকবর রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন।"

উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার

মালব

আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করে উত্তর ভারতের যে অঞ্চলটি অধিকার করেন তা হলো মালব। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন বাজবাহাদুর। তিনি ছিলেন শের খান ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহের সময়ের শাসনকর্তা সুজ্জাত খানের পুত্র। বাজবাহাদুর শাসনকার্যে অমনোযোগী হয়ে সঙ্গীত ও বাইজি নিয়ে দিন

অতিবাহিত করছিলেন। ১৫৬১ খ্রি. আকবর ধাত্রীমাতা মাহ্‌ম আন্‌গ-এর পুত্র আদম খানকে মালব অধিকারের জন্য পাঠান। আদম খান বাজবাহাদুরকে পরাজিত করে মালব অধিকার করেন এবং রাজধানী সারাংপুর লুণ্ঠন করেন। এসঙ্গে মালবের জনসাধারণ ও নারীদের ওপর আদম খান অত্যাচার শুরু করেন। এই অত্যাচারের সংবাদ আকবরের কানে পৌঁছালে সঙ্গে সঙ্গে আদম খানকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে আগ্রা থেকে মালবের দিকে যাত্রা করেন (১৫৬১ খ্রি. ২৭ এপ্রিল)। ১৩ মে, ১৫৬১ খ্রি. আকবর মালবে পৌঁছলে আদম খান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং আকবরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু আকবর আদম খানকে পদচ্যুত করে পীর মহম্মদকে মালবের শাসনকর্তা নিয়োগ করে আগ্রায় ফিরে আসেন। পীর মহম্মদের দুর্বল শাসনের সুযোগে বাজবাহাদুর পুনরায় মালব অধিকার করলে আকবর সেনাপতি আব্দুল্লা খাঁ উজবেককে বাজবাহাদুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি মালব অধিকার করেন। অতপর মালবে আকবরের প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হয়। পরবর্তীকালে বাজবাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁকে 'একহাজারী' মনসবদার পদে নিয়োগ দান করেন।

গন্ডোয়ানা

১৫৬৪ খ্রি. আকবর কারা ও পূর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তা আসফ খাঁকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী দিয়ে মধ্য প্রদেশের গড় কাটাঙ্গার রাজ্য গন্ডোয়ানা জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন গন্ডোয়ানার রাজা বীরনারায়ণ ছিলেন নাবালক। এই সময়ে রাণী মাতা দূর্গাবতী বীরনারায়ণের অভিভাবিকা রূপে রাজ্য শাসন করছিলেন। রাজমাতা দূর্গাবতী যেমনি ছিলেন সাহসী তেমনি ছিলেন বিদূষী। তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে গড়ের পূর্বদিকে নারহীতে দুদিন মুঘল সৈন্যকে প্রতিহত করেন। কিন্তু প্রতিহত করতে গিয়ে মুঘল সৈন্যের তীরের আঘাতে আহত হন এবং নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করেন। বালক রাজা বীরনারায়ণ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। আসফ খাঁ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য মণিমুক্তার গন্ডোয়ানা রাজ্য থেকে হস্তগত করেন। এভাবে গন্ডোয়ানা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আকবর তথাকার পুরাতন রাজবংশের চন্দ্র শাহ নামক এক ব্যক্তির হস্তে গন্ডোয়ানার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিনিময়ে গন্ডোয়ানাকে স্বীয় রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল শাসনাধীনে ছেড়ে দিতে হয়। চন্দ্র শাহ আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন।

উজবেক বিদ্রোহ

গন্ডোয়ানা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৫৬৫ খ্রি. মালবের শাসনকর্তা আবদুল্লা খাঁ উজবেক, জৌনপুরের শাসনকর্তা উজবেক নেতা খান জামান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁদের বিদ্রোহের সুযোগে আকবরের ভ্রাতা মীর্জা হাকিমও নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট ঘোষণা করে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। আকবর একে একে তিনটি বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করেন এবং বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন।

রাজপুতনা

উজবেক বিদ্রোহ দমন করে আকবর রাজপুতনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ আকবর উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজপুতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন অপরিহার্য। এছাড়া রাজপুতনার মধ্যে দিয়েই উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অংশের বাণিজ্য পথ ছিল। এসব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে আকবর প্রথম থেকেই রাজপুত জাতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৫৬২ খ্রি. তিনি মানসিক শান্তি ও পুত্র কামনায় পদব্রজে আজমীরে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির মাজার পরিদর্শন করতে যান। পথিমধ্যে অম্বরের রাজা বিহারীমল এবং বহু রাজপুত দলপতি বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। বিহারীমল নিজ কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দেন। এই রাজপুত কন্যাই জাহাঙ্গীরের মাতা। বিহারীমল, তৎপুত্র ভগবান

দাস ও পৌত্র মানসিংহ আকবরের সৈন্যবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করে পরবর্তী সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

কালক্রমে মুঘল-রাজপুত মৈত্রী আকবরের সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সকল রাজপুত রাজা এ নীতি গ্রহণ করেননি। মেবারের রাণা রাজপুত প্রতিরোধকারীদের মধ্যমণি ছিলেন। এ সময়ে মেবারের রাণা ছিলেন উদয় সিংহ। রাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উদয় সিংহ মেবারের রাণা হন। তবে তিনি বিহারীমলের মত বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। ১৫৬৭ খ্রি. আকবর মেবার আক্রমণ করে চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। মেবারের রাজা উদয় সিংহ পালিয়ে আরাবল্লীর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। প্রায় চার মাস চিতোর দুর্গ অধিকারের চেষ্টার পর একদিন আকস্মিকভাবে আকবরের গুলিতে রাজপুত বীর জয়মলের মৃত্যু হলে চিতোর দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং মুঘল সেনাবাহিনী চিতোর দুর্গে প্রবেশ করে। রাজপুত সৈন্যগণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেয়। রাজপুত রমণীগণ 'জওহর ব্রত' অবলম্বন করে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেন। এভাবে চিতোর দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আসে।

চিতোর দুর্গের পতনে অন্যান্য রাজপুত রাজাগণ দারুনভাবে ভীত হয়ে পড়েন। একে একে রণথম্ভোরের অধিপতি সুজন, কালিঞ্জরের অধিপতি রাজা রামচাঁদ বাঘেল, যোধপুরের রাজা মালদেবের পুত্র চন্দ্র সেন, বিকানীর রাজা কল্যাণমল এবং তাঁর পুত্র রাই সিং এবং জয়সলমীরের রাজা রাওয়াল হর রাই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

প্রায় বিনাযুদ্ধে সমগ্র রাজপুতনা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও মেবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেনি, যদিও মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন ঘটেছিল। ইতোমধ্যে মেবারের রাণা উদয় সিংহের মৃত্যু (১৫৭২ খ্রি.) হলে তাঁর পুত্র প্রতাপ সিংহ মেবারের রাণা হন। তিনি উদয়পুর, কুম্ভল ও গোগুন্ডায় শক্তি সঞ্চয় করে চিতোর পুনরুদ্ধারের সংকল্প করেন। আকবর অত্যন্ত উদার শর্তে রাণা প্রতাপ সিংহকে আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নেন। আকবর ১৫৭৬ খ্রি. এপ্রিল মাসে রাজা মানসিংহ ও আসফ খাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।প্রতাপ সিংহ মুঘল সৈন্যবাহিনীকে মন্ডলগড়ের মধ্য দিয়ে গোগুন্ডায় অগ্রসর হবার মুখে হলদিঘাট নামক গিরিপথে প্রতিরোধ করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন তারিখে উভয় বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতাপ সিংহ মুঘল সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ফলে গোগুন্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। অতপর সিরোহি, ইদার, বনস্ওয়ারা, দুঙ্গরপুর, ওর্ছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যসমূহ আকবরের নিকট তথা মুঘলদের নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে। ১৫৭৮ খ্রি. পুনরায় আকবর শাহবাজ খানকে রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুঘল সেনাবাহিনী কেলওয়ারা, কুম্ভলগড় ও গোগুন্ডায় প্রবেশ করলে রাণা প্রতাপ সিংহ চবন্দ নামক স্থানে আত্মগোপন করেন। অতপর সুযোগ বুঝে তিনি কুম্ভলগড় পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং বনস্ওয়ারা ও দুঙ্গরপুরের ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শাহবাজ খান তাঁকে দমন করতে পারেননি। ১৫৮৪ খ্রি. আকবর রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে জাফর বেগ ও জগন্নাথকে প্রেরণ করেন। তাঁরাও ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ১৫৯৭ খ্রি. রাণা প্রতাপ সিংহ মৃত্যুবরণ করেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি আজমীর, চিতোর ও মন্ডলগড় ব্যতীত তাঁর হৃতরাজ্যের অনেকাংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী অমর সিংহের বিরুদ্ধে আকবর ১৫৯৯ খ্রি. শাহজাদা সেলিম ও রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে অমরসিংহ পরাজিত হন। তথাপি সমগ্র মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। মেবারের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

পশ্চিম ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার

গুজরাট

মালব ও রাজপুতনা অধিকারের পর আকবর উত্তর ভারতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন। অতপর তিনি পশ্চিম ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল গুজরাট জয়ে মনস্থ করেন। গুজরাট শস্যে, সম্পদে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ ছিল। দিল্লির সুলতানি আমলেই বস্ত্রশিল্পে গুজরাট ভারতে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়। অবশ্য আকবরের গুজরাট অভিযানের পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণ ছিল–

(১) বিদ্রোহী মীর্জারা গুজরাটে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁদের দমন করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

(২) গুজরাট ছিল সমুদ্রপথে ভারতের বাইরের দেশের যোগাযোগ ক্ষেত্র।

(৩) পর্তুগিজদের কর্মকান্ডের ওপর নজর রাখার প্রয়োজনে গুজরাট মুঘলদের অধিকারে রাখা জরুরি ছিল।

(৪) গুজরাটের কিছু সংখ্যক আমীর আকবরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন।

(৫) গুজরাটের প্রভুত সম্পদ ও বাণিজ্য ঘাঁটি আকবরকে গুজরাট অধিকারে উৎসাহিত করে।

৭ নভেম্বর ১৫৭২ খ্রি. আকবর ইতিমদ নামে স্থানীয় একজন আমীরের আহ্বানে গুজরাটের পাটল নামক স্থানে সসৈন্যে উপস্থিত হন। সেখান থেকে আহমেদাবাদ যান। আকবর সহজেই গুজরাট জয় করেন। অতপর তিনি ৮ ডিসেম্বর ১৫৭২, আহমেদাবাদ থেকে ক্যাম্বেতে যান। সেখান থেকেই তিনি বিদ্রোহী মীর্জাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে ইব্রাহিম হুসেন মীর্জা বরোদায়, মহম্মদ হোসেন মীর্জা সুরাটে এবং শাহ মীর্জা চাম্পানেরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৫৭৩ খ্রি. জানুয়ারি মাসে মীর্জা গোষ্ঠীর বিদ্রোহীরা মুঘল সৈন্যদের হাতে পরাজিত হয়। গুজরাটের শাসনভার খান আজমের হস্তে অর্পণ করে আকবর ফতেপুর সিক্রীতে ফিরে আসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে পলাতক বিদ্রোহীরা বিক্ষুব্ধ আমীরদের সহায়তায় সুরাট, ব্রোজ, ক্যাম্বে ও আহমেদাবাদ অধিকার করে নেয়। আকবর আগস্ট থেকে অক্টোবর ১৫৭৩ খ্রি. তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান করে পুনরায় সেসব এলাকা মুঘলদের অধিকারে এনে গুজরাটকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম 'সুবা'য় পরিণত করেন।

গুজরাট বিজয় আকবরের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। কারণ এর ফলাফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী।

প্রথমত, গুজরাট অধিকার করার ফলে সমুদ্রে এবং পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধশালী বন্দরগুলোর ওপর মুঘলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, গুজরাট বিজয়ের ফলে আকবর পর্তুগিজদের সংস্পর্শে আসেন। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং পর্তুগিজরা মক্কা যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আকবর পরিচিত হন।

তৃতীয়ত, সমুদ্র উপকূল অধিকৃত হওয়ায় মুঘলরা নৌবাহিনী গঠনের সুযোগ লাভ করে।

চতুর্থত, রাজা টোডরমল প্রথম গুজরাটে জমি-জরিপ করে আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।

পঞ্চমত, গুজরাট বন্দর থেকে আদায়কৃত শুল্ক ও রাজস্ব মুঘল রাজকোষকে স্ফীত করে।

ষষ্ঠত, গুজরাট বিজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের দ্বার মুঘলদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার

বাংলা ও উড়িষ্যা

গুজরাট বিজয়ের পর আকবর ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। সুলেমান কররানী নামে একজন আফগান সর্দার বাংলার শাসক ছিলেন। তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। ১৫৭২ খ্রি. সুলেমান কররানীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দাউদ বাংলার শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুঘলদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে ১৫৭৪ খ্রি. স্বয়ং আকবর তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। দাউদকে পাটনা ও হাজীপুর থেকে বিতাড়িত করে আকবর দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। সেনাপতি মুনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল একে একে মুঙ্গের, তেলিয়াগড়ি, কোলগা, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান দখল করে নেন। এ সময়ে দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। দাউদকে পশ্চাৎধাবন করে মুনিম খাঁ ও টোডরমল ১৫৭৫ খ্রি. বালেশ্বরের নিকট তুকারয় নামক স্থানে তাঁকে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে দাউদ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুঘল সেনাবাহিনী ১৫৭৬ খ্রি. রাজমহলের যুদ্ধে দাউদকে পরাজিত করে। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ফলে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাংলার বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত ঢাকা ও ময়মনসিংহের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রমুখ স্থানীয় জমিদারগণ মুঘলদের আক্রমণ বহুদিন প্রতিরোধ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। পূর্বাঞ্চলের অপর রাজ্য উড়িষ্যা আরও কিছুকাল এক প্রকার স্বাধীন থেকে ১৫৯২ খ্রি. মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল

উত্তর-পশ্চিমে এবং পূর্ব ভারতে মুঘল আধিপত্য বিস্তার করার সময় আকবর সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। ভৌগোলিক কারণেও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছিল যেকোন ভারতীয় সাম্রাজ্যের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। আকবর এই সীমান্ত নিরাপদ ও নিজ অধিকারে রাখার জন্য সচেষ্ট হন।

কাবুল

আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হাকিম উত্তরাধিকার সূত্রে কাবুলের অধিপতি ছিলেন। মীর্জা হাকিম আকবরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে আকবর ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে আনুগত্য চেয়ে কাবুলে দূত পাঠান। এতে মীর্জা হাকিম সাড়া না দেওয়ায় ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে আকবর তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁকে ক্ষমা করে পুনরায় কাবুলের শাসক নিযুক্ত করেন। ১৫৮৫ খ্রি. মীর্জা হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুল সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং আকবর মানসিংহকে কাবুলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

কাশ্মির

আকবরের সময় কাশ্মিরের শাসক ছিলেন ইউসুফ শাহ। কাবুল অধিকারের পর কাশ্মিরকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্য ইউসুফ শাহের সঙ্গে কূটনীতি ব্যর্থ হলে আকবর আক্রমণের পথ গ্রহণ করেন। ১৫৮৬ খ্রি. তিনি ভগবান দাস ও কাসিম খাঁকে সসৈন্যে কাশ্মির অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী ইউসুফ খাঁ ও তাঁর পুত্র ইয়াকুবকে যুদ্ধে পরাজিত করে কাশ্মির মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

সিন্ধু

কাশ্মির অধিকারের পর আকবর বৈরাম খাঁর পুত্র মুলতানের শাসনকর্তা আবদুর রহিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুর রহিম ১৫৯১ খ্রি. এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিন্ধু জয়ের জন্য অগ্রসর হন। তিনি তথাকার শাসক জানি বেগকে আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

কান্দাহার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সামরিক দিক বিবেচনা করলে কান্দাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই সিন্ধু ও কাশ্মির অধিকার করার পর আকবর ১৫৯৫ খ্রি. মধ্যযুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মীর মাসুমের নেতৃত্বে কূটকৌশলের মাধ্যমে বিনা-রক্তপাতে বেলুচিস্তান ও কান্দাহার অধিকার করেন। কান্দাহার অধিকারের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বৈদেশিক আক্রমণ হতে সুরক্ষিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার

উত্তর ও মধ্য ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তৃত করার পর আকবর দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসংকল্প হন। কারণ, দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর, গোলকুন্ডা, আহম্মদনগর ও খান্দেশ অধিকৃত হলে ভারতবর্ষ মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হবে। উপরন্তু আকবর বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিকের মতো তাঁর ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য পর্তুগিজদের ক্ষমতা দমন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যাতে পর্তুগিজরা দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের দরবারে আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে না পারে। বরং তাদের আধিপত্য সমুদ্রের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং আকবর সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি পরিচালনা করেন।

আত্মকলহে লিপ্ত দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তথাপি আকবর ১৫৯১ খ্রি. দূত মারফত দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের নিকট তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এই কূটনৈতিক ব্যর্থতার ফলেই তিনি যুদ্ধ দ্বারা দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম এবং আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৫৯৫ খ্রি. আহম্মদনগর অবরোধ করেন। কিন্তু আহম্মদনগরের বিধবা রাজকন্যা চাঁদ সুলতানা দক্ষ সেনাপতির মতো অমিত বিক্রমে নগর রক্ষায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু চাঁদ সুলতানা নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করে সৈন্যদের প্রেরণা দিলেও দীর্ঘ অবরোধে তাঁর শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এদিকে মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুঘলগণ চাঁদ সুলতানার সঙ্গে ১৫৯৬ খ্রি. সন্ধি স্থাপন করে। এই সন্ধির ফলে বেরার মুঘলদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং আহম্মদনগরের নাবালক সুলতান মুঘলদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কিন্তু এই চুক্তির শর্ত নিয়ে আহম্মদনগরে শীঘ্রই দলীয় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। চাঁদ সুলতানা চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁকে হত্যা করে এবং বেরার পুনরুদ্ধারের জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রায় চার বছর যুদ্ধ চলবার পর ১৬০০ খ্রি. আকবরের পুত্র দানিয়েল ও মুঘল সেনাপতি আবদুর রহিম আহম্মদনগর জয় করেন।

খান্দেশের শাসক সুলতান আলি খাঁ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁর পুত্র মীরণ বাহাদুর আকবরের সার্বভৌমত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হন। আকবর স্বয়ং ১৫৯৯ খ্রি. দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন। আকবর সহজেই খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করে শক্তিশালী আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অবরোধের পরও যখন আসিরগড় দুর্গের পতন হল না, তখন আকবর কৌশলে আসিরগড়ের সুলতানকে নিজ শিবিরে এনে তাঁর সৈন্যগণকে যুদ্ধ ত্যাগের আদেশ দিতে বাধ্য করেন। অতপর

আসিরগড়ের রাজ কর্মচারীগণকে বাদশাহ অর্থ দিয়ে বশীভূত করেন। আকবরের জীবনে এটাই ছিল শেষ দুর্গ বিজয়।

অতপর নববিজিত দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোকে আকবর আহম্মদনগর, বেরার ও খান্দেশ এই তিনটি সুবায় বিভক্ত করেন। শাহজাদা দানিয়েলকে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের সুবাগুলোর শাসক নিযুক্ত করেন।

সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়ীকরণে আকবরের ভূমিকা

আকবর দক্ষিণ ভারতের উত্তরাংশসহ প্রায় সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুঘলদের এই ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আকবর তাঁকে সুসংঘবদ্ধ করেছিলেন। এখানে আকবরের অনন্যসাধারণ শাসন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী সত্তা পরিত্যাগ করে মুঘলরা যে মহান জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল আকবর ছিলেন তার প্রকৃত রূপকার। তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই ঐক্য সুদৃঢ় করেছিল। তাঁর প্রতি প্রজাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তির প্রধান উৎস ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমব্যবহার করে আকবর যে জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সংহত করেছিল। শক্তিশালী রাজপুতদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক নীতি ও তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করেছিলো। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বন্ধু রাজপুতেরা যেমন সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির স্তম্ভ হবে, শত্রু রাজপুতেরা তেমনি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবে। আকবর রাজপুতদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এনেছিলেন। হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার তাঁর সাম্রাজ্যকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করেছিল। হিন্দুরা বিভিন্ন রাজপদে থেকে সাম্রাজ্যের সুপরিচালনায় তাঁদের শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি যখনই কোন রাজ্য অধিকার করতেন, তৎক্ষণাৎ সেখানে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এক সুশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন। নতুন বিজিত রাজ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা অবলম্বন করতেন। সেই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে আকবর সামাজিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করতেন। আকবর বিজিত সাম্রাজ্যের সব রাজ্যে একই রকম শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সমগ্র সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ীকরণ ও সংহতি দান করেছিলেন।

সারসংক্ষেপ

আকবর যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর (১৫৬১-১৬০১খ্রি.) সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি উত্তর ভারতের মালব, গন্ডোয়ানা, রাজপুতনা, গুজরাট, পূর্ব ভারতে বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতের আহম্মদনগর, বেরার, খান্দেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাবুল, কাশ্মির, কান্দাহার প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য সম্প্রসারণের ব্যাপারে আকবর সমর অভিযানের পাশাপাশি কূটনীতিকে একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে ব্যবহার করে সফলতা লাভ করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।

২. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* ঢাকা, ১৯৭৩।

৩. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট আকবর কত খ্রি. সিংহাসনে বসেন?
(ক) ১৫২৬ (খ) ১৫৫৬
(গ) ১৫৫৭ (ঘ) ১৬২৬।

২। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রি. সংঘটিত হয়েছিল?
(ক) ১৫৫৬ (খ) ১৬৫৬
(গ) ১৫২৬ (ঘ) ১৭৫৬।

৩। আকবরের সর্বশেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ কোনটি?
(ক) হলদিঘাটের যুদ্ধ (খ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ
(গ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (ঘ) রাণাঘাট যুদ্ধ।

৪। আকবর কত খ্রি. স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন?
(ক) ১৫৬০ (খ) ১৬০১
(গ) ১৫৫৬ (ঘ) ১৫৬৪।

৫। বালক আকবরের অভিভাবক হিসেবে কে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন?
(ক) আদম খাঁ (খ) মানসিংহ
(গ) বৈরাম খাঁ (ঘ) সিকান্দার শূর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। হিমু কে ছিলেন? তিনি কিভাবে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেছিলেন?
২। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
৩। আকবর কিভাবে বাংলা অধিকার করেন?
৪। বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি ও স্বহস্তে আকবরের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৫। গন্ডোয়ানা অধিকারের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
৬। গুজরাট অধিকারের প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
৭। আহম্মদনগর রক্ষার্থে চাঁদ সুলতানা কি ভূমিকা রেখেছিলেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট আকবরের রাজ্য বিস্তারের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দিন।
২। আকবরের উত্তর ভারত বিজয়ের বর্ণনা দিন।
৩। আকবর কিভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ - ২

আকবরের ধর্মনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আকবরের ধর্মনৈতিক বিবর্তন তথা তাঁর পরধর্ম সহিষ্ণুতায় প্রভাবান্বিত হবার কারণসমূহ জানতে পারবেন;*
- *আকবরের ধর্মনৈতিক বিবর্তনের পর্যায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *দ্বীন-ই-ইলাহীর বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *দ্বীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পারবেন।*

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মহামতি আকবরই ছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে সবচেয়ে উদার শাসক। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের আবাসভূমি ভারতে স্থায়ী ও স্থিতিশীল মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধর্ম বিষয়ে উদারতা এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর আনুগত্য ও সহযোগিতা ভিন্ন যে জাতীয় শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না, এ বিষয়টি আকবর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আকবর তাঁর ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় ঔদার্য এবং শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম নিরপেক্ষতা স্থাপনের দূরদর্শিতা প্রদর্শন করে ভারতবর্ষের জাতীয় শাসকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আকবরের ধর্মমতের মধ্যে পরধর্ম সহিষ্ণুতা, উন্নত পরিকল্পনা ও মহান ভাবাদর্শ নানা কারণে গড়ে উঠেছিল।

প্রথমত, সুলতানি আমলে ভক্তিবাদী মহাপুরুষ নানক, কবীর ও চৈতন্যদেব তাঁদের উদার চিন্তাধারার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে মিলন ও সহনশীলতার এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রতিভাবান রাষ্ট্রনীতিক আকবর এই সমন্বয়বাদী চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, আকবর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পরিবার ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে এক উদার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমন্ডল। তাছাড়া তাঁর পিতা ছিলেন 'সুন্নী' ও মাতা ছিলেন পারসিক 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত। মাতার উদারতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা পুত্রকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক বৈরাম খাঁ ছিলেন ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ব্যক্তি। বৈরাম খাঁ আবদুল লতিফের মতো উদার পারসিক পন্ডিতকে তাঁর গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর কাছে আকবর ধর্ম বিষয়ে উদারতা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা লাভ করেন।

তৃতীয়ত, আকবর কাবুলে থাকাকালীন পারস্য থেকে অত্যাচারিত হয়ে বহু সুফি দরবেশ সেখানে আসেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

চতুর্থত, স্বীয় রাজপুত মহীষীদের প্রভাব ও তাঁর বন্ধু ও সভাসদ আবুল ফজল, আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক ও ভ্রাতা ফৈজীর 'মুক্ত চিন্তা'র প্রভাব আকবরের ওপর গভীরভাবে পড়েছিল।

পঞ্চমত, বাদায়ুনীর মতে, আকবর রাজ্য জয় ও রাজকার্যে ব্যস্ততার মধ্যেও খুব ভোরে ফতেপুর সিক্রীর একটি পুরাতন ইমারতের পাথরের ওপর বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। এরূপ মানসিক পরিবর্তন আকবরকে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ষষ্ঠত, আকবর বাল্যকাল থেকে মুসলমানদের শিয়া, সুন্নী ও মেহদী-সুফি ধর্ম সম্প্রদায়গুলোর ধর্মীয় বিতর্কে বীতশ্রদ্ধ ও মর্মাহত হয়ে ক্রমেই সর্বধর্ম সারগ্রাহী হয়ে ওঠেন।

আকবরের ধর্মনৈতিক বিবর্তন

আকবরের ধর্মনৈতিক বিবর্তনকে ঐতিহাসিকগণ তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

প্রথম পর্যায় (১৫৬০–১৫৭৫ খ্রি.) ঃ এই সময়ে আকবর একজন সুন্নী মুসলমানের মতো ইসলাম ধর্মের সকল আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতেন। যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন এবং সুন্নী মতবাদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৫৭৫–১৫৮০ খ্রি.) ঃ এ সময়ে আকবর শেখ মুবারক এবং তাঁর দুই পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজীর সুফি মতবাদের প্রভাবে এবং উদারনৈতিক চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে 'আত্মা অবিনশ্বর এবং পরমাত্মার অংশ বিশেষ' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যান্বেষণে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যে ১৫৭৫ খ্রি. সকল ধর্মের সার আহরণের জন্য ফতেপুর সিক্রীতে 'ইবাদত খানা' নির্মাণ করেন এবং সেখানে ধর্ম ও দর্শনের মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিকে ধর্মালোচনার জন্য মুসলিম পন্ডিতদের আহ্বান করেন। কিন্তু গোড়া সুন্নীপন্থী শেখ আবদুল নবী, মকদম-উল-মূলক প্রমুখ উলেমারা উদারনৈতিক ধর্মালোচনার পরিবর্তে উদারপন্থী উলেমা শেখ মোবারক, আবুল ফজল ও ফৈজী পরিচালিত 'মুক্তচিন্তা' মতবাদীদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করে গোঁড়ামীর পরিচয় দেন। উপরন্তু এসব উলেমারা আকবরের জিজ্ঞাসু মনের উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। উলেমাদের পরস্পর বিরোধী এসব কার্যকলাপে ব্যথিত হয়ে আকবর কিছুদিন ইবাদতখানার আলোচনা বন্ধ রাখেন। এবং উলেমাদের ধর্মান্ধতায় বিরক্ত হয়ে তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট করতে তৎপর হন।

আকবর তাঁদের আলোচনায় অসন্তুষ্ট হয়ে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হন। উলেমাদের মধ্যে অবিরত দ্বন্দ্বের ফলে আকবর উপলব্ধি করেন যে, দ্বন্দ্ব ও বিভিন্নতার অবসান ঘটিয়ে 'নিরঙ্কুশ সত্য' অনুসন্ধান করতে হবে, সকল ধর্মীয় মতপার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ধর্মনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করতে হবে।

১৫৭৮ খ্রি. আকবর পুনরায় ইবাদতখানায় ধর্মালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময় মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের সঙ্গে হিন্দু, জৈন, পার্সি, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের পন্ডিতগণ ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুরুষোত্তম, দেবী, জৈনধর্মের হরি বিজয় সুরী, বিজয় সেন সুরা, ভানু চন্দ্র উপাধ্যায়, গোয়ার জেসুইট ধর্মযাজক ফাদার রিডোলফো ও ফাদার মানসারেট প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববিদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের ইবাদতখানাকে 'First World Religious Parliament' নামে অভিহিত করেছেন। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল– তুলনামূলক ধর্মালোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা। তিনি এসব ধর্মতত্ত্ববিদদের আলোচনা ও মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনতেন এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতেন। এখানেও উলেমাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ ও সংকীর্ণতা আকবরকে ব্যথিত করে। তিনি দেখতে পান যে, সকল ধর্মের মধ্যে সত্য রয়েছে , কিন্তু মানুষের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরায়ণতার ফলে তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই অবস্থায় সম্রাটকে ধর্মতত্ত্বসমূহের একজন ব্যাখ্যাকারী হওয়া প্রয়োজন। ২২ জুন ১৫৭৯, আকবর ফতেপুর সিক্রীর মসজিদের প্রধান ইমামকে বিতাড়িত করে সেই স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন এবং ফৈজীর লিখিত খুৎবা নিজ নামে পাঠ করেন। ২ সেপ্টেম্বর ১৫৭৯, আবুল ফজলের পিতা শেখ মোবারক রচিত বহুল বিতর্কিত 'মহজর'

নামক ঘোষণাপত্র জারি করে আকবর উলেমাদের ধর্মনৈতিক অধিকার খর্ব করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ একে 'অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallibility Degree) বলে অভিহিত করেছেন। আকবর নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ধর্মগুরু অর্থাৎ 'ইমাম-ই-আদিল' বলে ঘোষণা করেন। ফলে তিনি রাষ্ট্র ও ধর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করেন।

তৃতীয় পর্যায় (দ্বীন-ই-ইলাহী)ঃ ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক দর্শনাশ্রয়ী এক উদার মতবাদ ঘোষণার মধ্যদিয়ে আকবরের ধর্মনৈতিক জীবনের বিবর্তনের চরম পরিণতি ঘটে। তিনি মূলত পারস্পরিক ধর্ম-বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর করার জন্য এই ধর্মমত প্রবর্তন করেন। জেসুইট পাদ্রী বারতোলীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আকবর ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের সারবস্তু গ্রহণ করে এই নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেছিলেন। আকবর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিলেন তার উপযুক্ত জাতীয় ধর্ম হল 'দ্বীন-ই-ইলাহী'। এই ধর্মমতে বিশ্বাসীদের নিম্নলিখিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল–

(১) দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মমতে বিশ্বাসী অনুসারীগণ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হলে নতুন প্রথায় সম্ভাষণ করবেন। প্রথম ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল্লা জাল্লালুহু অর্থাৎ তার মহিমা বিকশিত হোক উচ্চারণ করবেন।

(২) সাধারণত মৃত্যুর পরে যে ভোজ দেওয়া হয় দ্বীন-ই-ইলাহীর সদস্যগণকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য জীবিত অবস্থায় সে ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক সদস্যকে জন্মদিবস পালন এবং প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) দ্বীন-ই-ইলাহীর সদস্যগণ যতদূর সম্ভব মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। তবে মাংসভোজীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না।

(৫) কসাই, ধীবর এবং ব্যাধ প্রভৃতি নিচ জাতির লোকদের সঙ্গে দ্বীন-ই-ইলাহীর সদস্যগণ মেলামেশা করতে পারবে না।

(৬) দ্বীন-ই-ইলাহীর সদস্যদের সম্রাটের নিকট জান, মাল, সম্মান এবং ধর্ম সমর্পণ করতে হতো; যারা এই চারটি সমর্পণ করবেন তারা প্রথম শ্রেণীর সদস্য হিসেবে গণ্য হতেন। তিনটি সমর্পণ করলে দ্বিতীয় শ্রেণী, দুটি সমর্পণ করলে তৃতীয় শ্রেণী এবং একটি সমর্পণ করলে চতুর্থ শ্রেণীর সদস্য হিসেবে মর্যাদা পেতেন।

আইন-ই-আকবরীর মতে, দ্বীন-ই-ইলাহীর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারো। তাঁদের মধ্যে শেখ মোবারক, আবুল ফজল, ফৈজী, মির্জা জানী, আজিজ কোকা এবং হিন্দুদের মধ্যে রাজা বীরবলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সদস্য স্বল্পতার বিষয় বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, দ্বীন-ই-ইলাহী প্রচারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। 'দ্বীন-ই-ইলাহী' সম্রাটের দ্বারা প্রবর্তিত হলেও তিনি কখনও কারও মতের বিরুদ্ধে এই ধর্মমত গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ই-ইলাহী কোন ধর্ম নয়। কারণ এতে কোন প্রেরিত পুরুষ বা কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই। এটা স্পষ্ট যে আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহী রাজনৈতিক কারণে প্রবর্তন করা হয়েছিল। আকবরের ইচ্ছা ছিল ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। এতে তিনি সফল হয়েছিলেন।

বাদায়ুনী আকবরের এই ধর্মমতের সমালোচনা করেছেন। বাদায়ুনী আকবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, আকবর দ্বীন-ই-ইলাহী প্রবর্তনের পর কতগুলো অনুশাসন জারি করেছেন, যেমন– শুক্রবারে জুমআ'র নামাজ, রমজান মাসে রোজা, গরুর মাংস খাওয়া, নতুন মসজিদ নির্মাণ ও মক্কা তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধকরণ। কিন্তু

বাদায়ুনীর এ বক্তব্য সঠিক নয়। প্রথমত তিনি আকবরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। কারণ পদমর্যাদার দিক দিয়ে আবুল ফজলকে আকবর তাঁর ওপর স্থান দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি গোড়াপন্থী হিসেবে প্রচলিত ধর্মমতের পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ হন। আকবরের বিরুদ্ধে সমালোচক বাদায়ুনী ও জেসুইট পাদ্রীদের তথ্যের ওপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন "দ্বীন-ই-ইলাহী আকবরের জ্ঞানের পরিচয় নয়, নির্বুদ্ধিতার চরম নিদর্শন এবং সম্রাটের অহংবোধের ও অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত।" উল্লেখিত দুজন আকবর বিদ্বেষীর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মিথ, এডওয়ার্ড গারেট, ব্লকম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ, এম. এল. রায়চৌধুরী, বেভারিজ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন, আকবর কখনো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। স্যার টমাস রো মন্তব্য করেন, আকবর একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক ড. রায়চৌধুরী বলেছেন, 'দ্বীন-ই-ইলাহী' আল-কোরআন ও পারসিক সুফি মতবাদের নির্যাস। তিনি বলেছেন, 'It was after all a sufi order of Islam within Islam'.

প্রকৃতপক্ষে, 'দ্বীন-ই-ইলাহী'তে ধর্মের ছাপ থাকলেও এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দলিল। আকবর দ্বীন-ই-ইলাহীকে কোন ধর্মমতের রূপ না দিয়ে একে মানুষের নৈতিক জীবনবাদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগই উঠুক না কেন, তিনি মধ্যযুগের বিশ্ব ইতিহাসে পরধর্ম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। স্মিথ, এডওয়ার্ড গারেট, ব্লকম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিক যাই বলুন না কেন একথা অনস্বীকার্য যে, আকবরের সমকালীন ইউরোপও পরধর্ম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। আকবর যখন পরধর্ম সহিষ্ণুতা নীতি প্রবর্তন করেছেন, তখন ইউরোপে ক্যাথলিকদের হাতে প্রোটেস্ট্যান্টরা নির্যাতিত হচ্ছিল। 'দ্বীন-ই-ইলাহী' আকবরকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহান জাতীয় সম্রাটে পরিণত করে।

সারসংক্ষেপ

আকবর ছিলেন একজন ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত মানবপ্রেমী মানুষ। তিনি তাঁর পিতা-মাতা, গৃহশিক্ষক সুফি-দরবেশের সংস্পর্শে এসে পরধর্ম সহিষ্ণুতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ সঙ্গে কবীর, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি সমন্বয়বাদী মহাপুরুষের দর্শনে প্রভাবান্বিত হয়ে বিভিন্ন ধর্মের সত্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। তুলনামূলক ধর্মালোচনার জন্য ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্মের ধর্মতত্ত্ববিদগণকে আকবর তাঁর ইবাদতখানায় আমন্ত্রণ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ তাদের বক্তব্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। ধর্মতত্ত্ববিদদের এই বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা দূর করার জন্য আকবর দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। এতে ধর্মের ছাপ থাকলেও এটি মূলত একটি রাজনৈতিক দলিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1970.
২. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩।
৩. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আকবরের পিতা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

(ক) শিয়া (খ) সুন্নী
(গ) ফারায়েজী (ঘ) কোনটিই নয়।

২। বৈরাম খাঁ কাকে আকবরের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন?
(ক) শেখ মোবারক (খ) আবদুল লতিফ
(গ) আবুল ফজল (ঘ) ফৈজী।

৩। আকবর কত খ্রিস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) ১৬৭৫ (খ) ১৫৭৫
(গ) ১৫৮১ (ঘ) ১৫৬০।

৪। পুরুষোত্তম ও দেবী কোন ধর্মের ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন?
(ক) হিন্দু (খ) জৈন
(গ) ইসলাম (ঘ) বৌদ্ধ।

৫। দ্বীন-ই-ইলাহী কত খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করা হয়?
(ক) ১৫৭৫ (খ) ১৫৮১
(গ) ১৫৬০ (ঘ) ১৫৫৬।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কি কি কারণে আকবরের ধর্মমতে পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে উঠেছিল?
২। আকবরের ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উল্লেখপূর্বক সেখানে ধর্মালোচনায় উলেমাদের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩। ইবাদতখানায় ধর্মালোচনায় মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ব্যতীত অন্যান্য ধর্মতত্ত্ববিদদের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৪। দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মমতে বিশ্বাসীদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলো উল্লেখ করুন।
৫। দ্বীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত ব্যক্ত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। আকবরের ধর্মনীতি আলোচনা করুন।
২। দ্বীন-ই-ইলাহীর বিশেষ উল্লেখপূর্বক আকবরের ধর্মনীতি পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৩

আকবরের রাজস্বনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আকবরের রাজস্বনীতির মূল লক্ষ্য, তাঁর শাসন আমলের প্রথম দিকে রাজস্ব-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *আকবর কর্তৃক রাজা টোডরমলকে দিওয়ান নিয়োগ এবং রাজস্ব-সংস্কারে তাঁর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *আকবরের আমলে ভূমি-জরিপ, ভূমির শ্রেণী বিভাগ, রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি, রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে পারবেন;*
- *আকবরের রাজস্বনীতির ফলাফলের বিবরণ দিতে পারবেন।*

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজী সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের মাধ্যমে কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক রাজস্ব ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। রাজস্ব আদায়কারী যাতে কৃষকদের নিকট থেকে বেশি পরিমান অর্থ বা শস্য জোর করে আদায় করতে না পারে আলাউদ্দিন খলজী সে ব্যবস্থা করে আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের পর শেরশাহই প্রথম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে ভূমি-রাজস্বই হল অর্থনীতির মেরুদন্ড। তাই তিনি দেশের সমস্ড় জমি জরিপ করে রাজস্ব পদ্ধতিকে জন কল্যাণকর করতে সচেষ্ট হন। শেরশাহের স্বল্পকালীন শাসনে তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থা সর্বত্র কার্যকরী হয়নি। তাছাড়া শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় বিশৃঙ্খলার ফলে তাঁর রাজস্ব পদ্ধতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। হুমায়ুনের স্বল্পকালীন রাজত্বে এই ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। আকবর শেরশাহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি অবলম্বন করে রাজস্ব পদ্ধতিকে আরো বিজ্ঞানসম্মত করে আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, আকবরের রাজস্বনীতি ছিল নিখুঁত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়।

আকবরের রাজস্বনীতির মূল লক্ষ্য ছিল দু'টি–

১) অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা এবং আয় বৃদ্ধি করা;

২) প্রজাসাধারণকে সুখে সমৃদ্ধিতে রাখা।

এই দু'টি আপাত বিরোধী নীতির সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক রাজস্ব পদ্ধতির প্রবর্তন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিভাদীপ্ত শাসক আকবর রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে মনোনিবেশ করেন।

আকবর সর্বপ্রথম খাজা আবদুল মজিদকে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করে রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। দিওয়ান খাজা আবদুল মজিদ প্রত্যেক সরকারের রাজস্ব নির্ধারণ এবং উৎপাদিত শস্যের আদর্শ দর নির্ধারণের প্রয়াস চালান। কিন্তু তিনি বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারেননি। অতপর আকবর মুজাফফর খান তুরবতীকে দিওয়ান পদে নিয়োগ দিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের চেষ্টা করেন। তুরবতী রাজা

টোডরমলের সহায়তায় রাজস্ব সম্পর্কীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য দশজন কানুনগো নিযুক্ত করেন। কানুনগোগণ সুনির্দিষ্ট কতগুলো সুপারিশ প্রদান করেন। কিন্তু উজবেক বিদ্রোহ দমনে আকবর ব্যস্ত থাকার দরুন এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে পারেননি। ১৫৭৩ খ্রি. গুজরাট মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হলে আকবর রাজস্ব সংস্কারে পুনরায় মনোযোগ দেন। তিনি রাজা টোডরমলকে গুজরাটের ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। টোডরমল সর্বপ্রথম গুজরাটের সমস্ত জমি-জরিপ করে ভূমির গুণ ও আয়তন অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। গুজরাটে সাফল্য লাভের পর সামগ্রিকভাবে সমস্ত জমি জরিপ ও কর নির্ধারণের জন্য টোডরমল নিযুক্ত হন। ১৫৭৫ খ্রি. বাংলা, বিহার ছাড়া সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি খালসায় বা খাস বাদশাহী তত্ত্বাবধানে আনা হয় এবং জায়গীর বিলুপ্ত করা হয়। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৮২টি পরগণায় বিভক্ত করে প্রত্যেক পরগণায় একজন 'করোরী' নামক রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু করোরীদের অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণের ফলে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হলে আকবর করোরী দপ্তর বন্ধ করে দিয়ে পুরাতন রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি চালু করেন।

১৫৮২ খ্রি. আকবর টোডরমলকে দিওয়ান-ই-আশরাফ বা প্রধান রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করলে টোডরমল রাজস্ব নীতির আমূল পরিবর্তন করেন। তাঁর রাজস্ব নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল–

(১) আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ করা;

(২) প্রত্যেক বিঘার উৎপন্ন শস্যের গড় নির্ণয় করা;

(৩) প্রত্যেক বিঘার রাজস্বের হার নির্ধারণ করা।

টোডরমল কৃষি জমিগুলো জরিপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইলাহী গজ নামে এক প্রকারের নির্দিষ্ট পরিমাপের সাহায্যে তিনি জমির পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কৃষি জমি পরিমাপের পর উর্বরতা অনুযায়ী জমিগুলোকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

(১) পোলাজ ঃ সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলো পোলাজ নামে অভিহিত হতো। এরূপ জমি প্রত্যেক বৎসর চাষ করতে পারতো এবং এক বৎসরের জন্যও তা অকর্ষিত থাকতো না। কাজেই পোলাজ জমির জন্য প্রতি বৎসর খাজনা আদায় করা হতো।

(২) পারাউতি ঃ কয়েক বৎসর চাষাবাদের পর উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে এই জমিগুলোর চাষ বন্ধ রাখতে হতো।

(৩) চাচর ঃ এরূপ জমি তিন/চার বৎসরের জন্য চাষাবাদ বন্ধ থাকতো।

(৪) বঞ্জর ঃ এসব জমি পাঁচ বা ততোধিক বৎসর পতিত থাকতো। এগুলোকে সাধারণভাবে অনুর্বর জমি বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রত্যেক কৃষকের অধীনে তিন প্রকারের জমিই থাকতো। টোডরমল রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণের পর দশ বৎসর পূর্বেকার (১৫৭০–১৫৮০ খ্রি.) শস্যের উৎপাদন অনুসারে উল্লেখিত প্রথম তিন শ্রেণীর জমিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করে এবং উৎপন্ন শস্যের গড় হিসাব করে শস্যের এক-তৃতীয়াংশ দেয় রাজস্ব হিসেবে নির্ধারণ করেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক পরগণার জন্য পৃথক পৃথকভাবে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। জমির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থাও ছিল।

টোডরমল রাজস্ব নির্ধারণের পর রাজস্ব আদায়ের নীতি গ্রহণ করেন। পূর্বে সাধারণত শস্যের বাজার দর নির্ধারণপূর্বক তার সমপরিমাণ রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর বাজার দর নির্ধারণ করে কৃষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব আদায় করা ঝামেলার ব্যাপার ছিল। তাই টোডরমল দশ বৎসরের বাজার দর নিরূপণ করে তার গড় হিসেবে বাজার দর নির্ধারণ করে রাজস্ব নির্দিষ্ট করেন। কৃষকদেরকে জমির উৎপন্ন ফসল অথবা নগদ অর্থের দ্বারা রাজস্ব পরিশোধ করার সুবিধা দেওয়া হয়। এই

ব্যবস্থা 'জাবতি' ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 'জাবতি' ব্যবস্থা 'আইন-ই-দশশালা' নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যবস্থা বিহার, এলাহাবাদ, মুলতান, আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, আজমীর, গুজরাট এবং রাজপুতনার অংশবিশেষে প্রবর্তিত হয়।

আকবরের সময়ে 'জাবতি' ব্যবস্থা ছাড়াও ভূমি-রাজস্ব আদায়ের আরো দু'টি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থাগুলো 'গাল্লাবক্স' এবং 'নক্স' নামে পরিচিত। গাল্লাবক্স শব্দের অর্থ ফসল ভাগ। এই ব্যবস্থায় জমির উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। এতে ভূমি জরিপ করা বা শস্যের বাজার দর নির্ধারণ করার কোন প্রয়োজন পড়তো না। এই ব্যবস্থা সিন্ধু, কাশ্মির এবং কাবুলের অংশবিশেষে প্রবর্তিত হয়েছিল। নক্স ব্যবস্থা বহুলাংশে জমিদারী ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। এই ব্যবস্থায় জমি জরিপের পর উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের পরিবর্তে অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হতো। এই ব্যবস্থা একমাত্র বাংলায় প্রচলিত ছিল।

আকবর ভূমি-জরিপ এবং উৎপাদিত শস্যের ওপর ভিত্তি করে রাজস্ব নির্ধারণে যে যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব আদায়েও অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। রাজস্ব আদায় এবং শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় ভাগ করেন। প্রতিটি সুবাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রতিটি সরকারকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। আকবর কেন্দ্রে একজন দেওয়ান এবং প্রত্যেক সুবায় একজন করে দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রত্যেক সরকারে থাকতেন একজন আমিন। আমিনকে সহযোগিতা করার জন্য বিতিকচি, পোদ্দার, কানুনগো, চৌধুরী, পাটোয়ারী এবং মুকাদ্দম প্রমুখ কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। আমিনকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হতো। কৃষকগণ যাতে কোনরকমে উৎপীড়িত না হয় সেদিকেও আমিনকে লক্ষ্য রাখতে হতো। নির্দিষ্ট রাজস্বের বেশি আদায় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। রাজস্ব বিভাগের প্রতিটি কর্মচারীর হিসাব পরীক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমিনের। সমস্ত আবাদী জমি যাতে কৃষি কার্যে নিয়োজিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমিনের কর্তব্য ছিল।

'বিতিকচি' ছিলেন আমিনের সমমর্যাদাসম্পন্ন অপর রাজস্ব কর্মচারী। তার দায়িত্ব ছিল জমির নথিপত্র সংরক্ষণ করা এবং কানুনগোদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ এবং আদায়ী করের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা। পোদ্দারের দায়িত্ব ছিল কৃষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত কর গ্রহণ করে তাদের রশিদ প্রদান করা। 'পরগণা' স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন চৌধুরী। স্থানীয় ভূমি রাজস্বের পরিচালনার সঙ্গে তিনি একাধিকভাবে জড়িত ছিলেন। চৌধুরীর দপ্তরটি বংশানুক্রমিক ছিল। প্রতিটি গ্রামের রাজস্ব কর্মচারী হলেন মুকাদ্দম ও পাটোয়ারী।

আকবর কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বদা যত্নবান ছিলেন। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে ফসলহানি ঘটলে কৃষকদের খাজনা মওকুফ করে দিতেন। দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকগণকে ঋণ প্রদান করতেন। কোন রাজস্ব আদায়কারী অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো।

রাজস্বনীতির ফলাফল

আকবরের রাজস্বনীতির ফলে সাম্রাজ্যের কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। এতে উভয়পক্ষ লাভবান হয়।

প্রথমত, রাজস্বের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হওয়ায় অন্যায়ভাবে কর আদায়ের পথ বন্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত, জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় কৃষককে জমিচ্যুত করার সম্ভাবনা দূর হয়।

তৃতীয়ত, পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের শাসনামলে রাজস্বের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল নতুন ব্যবস্থা তার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

চতুর্থত, রাজস্ব ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হয় এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে রাজস্ব মওকুফের নীতি এবং কৃষকদের ঋণ প্রদান ইত্যাদি কৃষকদের উৎসাহিত করে।

ষষ্ঠত, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। তাতে রাষ্ট্রের পক্ষে জনকল্যাণকর কাজ করা সম্ভব হয়।

সারসংক্ষেপ

আকবর রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমগ্র এলাকায় ভূমি-জরিপ, চাষের ধরন অনুযায়ী জমির শ্রেণী বিন্যাস, জমির উর্বরতা অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ, রাজস্ব আদায়ের জন্য আমিন, বিতিকচি, কানুনগো প্রমুখ কর্মচারী নিয়োগ এবং রাজস্ব আদায় ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সাম্রাজ্যকে সুবা, সরকার, পরগণা ইত্যাদিতে বিভক্ত করে এক সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এতে একদিকে যেমন কৃষকগণ লাভবান হয় অন্যদিকে রাষ্ট্রও সমৃদ্ধশালী হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.
২. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।
৩. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আকবর সর্বপ্রথম কাকে দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন?
(ক) খাজা আবদুল মজিদ (খ) বৈরাম খান
(গ) রাজা টোডরমল (ঘ) মুজাফফর খান তুরবতী।

২। আকবর রাজা টোডরমলকে সর্বপ্রথম কোন বিজিত অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব দেন?
(ক) আমজীর (খ) গুজরাট
(গ) কাবুল (ঘ) সিন্ধু।

৩। কত খ্রি. রাজা টোডরমলকে দেওয়ান-ই-আশরাফ পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল?
(ক) ১৫৭৩ (খ) ১৫৮২
(গ) ১৫৫৬ (ঘ) ১৫৭৫

৪। সর্বোৎকৃষ্ট চাষাবাদযোগ্য জমিকে কি নামে অভিহিত করা হতো?
(ক) পারাউতি (খ) পোলাজ
(গ) চাচর (ঘ) বঞ্জর।

৫। আকবরের সময়ে বাংলায় কোন প্রথায় ভূমি রাজস্ব আদায় করা হতো?
(ক) জাবতি (খ) গাল্লাবক্স

(গ) নক্স (ঘ) কান্‌কুট।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। টোডরমলের রাজস্ব সংস্কার-পূর্ব আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
২। টোডরমলের রাজস্বনীতির উল্লেখপূর্বক জরিপের মাধ্যমে জমির শ্রেণীবিন্যাসকরণ বর্ণনা করুন।
৩। টোডরমল কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের নীতিসমূহের বিবরণ দিন।
৪। আকবরের আমলে রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিন।
৫। আকবরের রাজস্বনীতির ফলাফল বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। আকবরের রাজস্বনীতি বর্ণনা করুন।
২। আকবরের রাজস্ব সংস্কারে রাজা টোডরমলের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
৩। আকবরের রাজস্ব সংস্কারের ফলাফলের বিশেষ উল্লেখপূর্বক তাঁর রাজস্বনীতির বর্ণনা দিন।

পাঠ - ৪

জাহাঙ্গীর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক গৃহীত জনহিতকর কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে পুত্র খসরু ও খুর্‌রম (শাহজাহান) এবং সেনাপতি মহব্বৎ খানের বিদ্রোহ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস বিবৃত করতে পারবেন;*
- *সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিবাহ, সম্রাটের ওপর তাঁর প্রভাব এবং সম্রাটের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক প্রভৃতির বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।*

সম্রাট আকবরের অনেকগুলো সন্তান পরপর শৈশব অবস্থায় মারা যাওয়ার পর ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যার গর্ভজাত সন্তান। শেখ সেলিম চিস্তির দয়ায় এই সন্তানের জীবন রক্ষা পেয়েছে বলে আকবর সন্তানের নাম রাখেন সেলিম। স্নেহভরে ডাকতেন 'সেখুবাবা' বলে। আকবরের জীবিতকালেই আকবরের অপর দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়েল অল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। স্বভাবতই আকবরের উত্তরাধিকারী হিসেবে সেলিমের দাবি অগ্রগণ্য ছিল। ১৬০৫ খ্রি: আকবরের মৃত্যু হলে সেলিম 'নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে ছত্রিশ বৎসর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৬০০ খ্রি: আকবরের জীবদ্দশায় সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় অনেকে মনে করেছিলেন যে, সম্রাট আকবর সেলিমের পুত্র খসরুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আকবর সেলিমকে ক্ষমা করেন এবং মৃত্যুশয্যায় সেলিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

সিংহাসনে বসে জাহাঙ্গীর তাঁর বিরোধিতাকারীদের ক্ষমা করেন। তাঁদেরকে পূর্ববর্তী পদে বহাল করেন। এসঙ্গে কতগুলো জনহিতকর কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন। মহান পিতার প্রজা বাৎসল্যের দিকে তাকিয়ে প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য আগ্রা দুর্গ হতে যমুনা পর্যন্ত ষাটটি ঘন্টাযুক্ত ত্রিশ গজ লম্বা একটি সোনার

শিকল ঝুলিয়ে দেন। এর ফলে যেসব প্রজা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতো তারা শিকলে টান দিয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। সম্রাটও সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ইতিহাসে এই ঘন্টা Bell of Justice বা ন্যায়বিচারের ঘন্টা নামে পরিচিত। এছাড়া সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে ১২টি শাসনতান্ত্রিক বিধি জারি করেন। যথা–

১। তামঘা ও মীর-বাহরী নামক পণ্য ও বাণিজ্য শুল্ক রহিতকরণ।

২। মদ ও অন্যান্য নেশার দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধকরণ।

৩। বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল নিষিদ্ধকরণ।

৪। গরীব জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল স্থাপন ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ।

৫। অপরাধীর নাক-কান কেটে শাস্তি দেওয়ার প্রথা বাতিলকরণ।

৬। নির্দিষ্ট দিনে পশুহত্যা নিষিদ্ধকরণ।

৭। মনসবদার ও জায়গীরদার প্রথার স্থিতিশীলতার জন্য তাদের নিজ পরগনায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধকরণ।

৮। রবিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

৯। আইমা বা ওয়াক্‌ফ জমির নির্দিষ্টকরণ।

১০।দুর্গ ও কারাগারের সকল বন্দিদের প্রতি রাজনৈতিক ক্ষমা প্রদান।

১১।রাহাজানি ও চুরি বন্ধ করার ব্যবস্থাকরণ।

১২।উত্তরাধিকারী বিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান।

পুত্র খসরুর বিদ্রোহ

মেবার

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো পিতার বিরুদ্ধে পুত্র খসরুর বিদ্রোহ। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ মাস পর খসরু কয়েকশত অনুচর নিয়ে আগ্রা ত্যাগ করে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। মথুরায় তাঁর সাথে হোসেন বেগ বাদাকশালী এবং পানিপথে লাহোরের দেওয়ান আবদুর রহিম যোগ দিয়ে খসরুর শক্তি বৃদ্ধি করেন। খসরু অচিরেই লাহোর দুর্গ অবরোধ করেন। পুত্রের বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাট স্বয়ং পুত্রকে দমন করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। খসরু সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়ে হোসেন বেগকে সঙ্গে নিয়ে কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু চেনাব নদী অতিক্রম করার সময় সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর হাতে অনুচরসহ খসরু বন্দি হন। জাহাঙ্গীর খসরুকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। তাঁর অনুচরদের হত্যা করা হয়। খসরুকে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রুদ্ধ সম্রাট কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং কারারক্ষীদের অত্যাচারে অর্জুনের মৃত্যু ঘটে। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর পিতৃস্নেহবশত খসরুর প্রতি সম্রাটের মনোভাব নরম হয়। কিন্তু ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে খসরু জড়িত আছেন মনে করে সম্রাট চারজন ষড়যন্ত্রকারীকে প্রাণদন্ড দেন এবং খসরুকে অন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। যথারীতি সম্রাটের নির্দেশ প্রতিপালিত হয়। অবশ্য খসরু পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাননি এবং পরে সম্রাট অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

দশ বৎসর পর সম্রাটের আদেশে অর্ধঅন্ধ খসরুকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার সঙ্গে নিজের পূর্ব বিবাহজাত কন্যা লাডলী বেগমের বিবাহ দিয়ে শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে উদ্যোগী হন। এই পথকে নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে নুরজাহান শাহজাদা খসরুকে তাঁর ভ্রাতা আসফ খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। আসফ খাঁ তাঁকে শাহজাদা খুর্‌রমের (শাহজাহান) তত্ত্বাবধানে রাখেন। খসরুর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে খুর্‌রম ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাজা বাহাদুর নামে এক দুর্বৃত্ত ব্যক্তির দ্বারা খসরুকে হত্যা করান। এভাবে হতভাগ্য খসরুর জীবনাবসান ঘটে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিবাহ ও তাঁর প্রভাব

১৬১১ খ্রিঃ সম্রাট জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে বিবাহ করেন। নুরজাহানের বিবাহপূর্ব জীবনের নাম ছিল মেহেরুন্নিসা। তিনি ছিলেন বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের পত্নী এবং মির্জা গিয়াস বেগ-এর কন্যা। মেহেরুন্নিসার সঙ্গে যুবরাজ সেলিমের প্রণয় নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, সম্রাট আকবর অসাধারণ সুন্দরী মেহেরুন্নিসার প্রতি সেলিমের আসক্তি দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী শের আফগানকে হত্যা করে মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন। মেহেরুন্নিসার বিবাহের পর নতুন নামকরণ হয় 'নুরজাহান'। শীঘ্রই জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে প্রধান বেগমের মর্যাদা দান করেন। আরবি ও ফারসি সাহিত্যে নুরজাহানের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমস্যা অনুধাবন করার যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য-প্রিয় নারী ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শিল্পকলার যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে তা প্রধানত নুরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভবপর হয়েছিল। রাজ্য শাসন ব্যাপারে জাহাঙ্গীর ক্রমশঃ নুরজাহানের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নুরজাহান নিজ ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য একটি গোষ্ঠিচক্র গঠন করেন। এই গোষ্ঠিচক্রে তাঁর পিতা মির্জা গিয়াস বেগ (ইতিমাদ উদ্দৌলা), ভ্রাতা আসফ খাঁ এবং প্রথম দিকে যুবরাজ খুররমও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের সঙ্গে প্রথম বিবাজহাত কন্যা লাডলী বেগমের বিবাহ দিলে খুররম নুরজাহানের স্নেহদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হন। অন্যদিকে নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা আরজুমন্দ বানুর সঙ্গে শাহজাদা খুর্‌রমের বিবাহ হলে আসফ খাঁ নিজের জামাতাকে দিল্লির সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী করার বাসনা পোষণ করতে লাগলেন।

জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য বিস্তার

পিতা আকবরের মতোই জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। আকবর সমগ্র রাজপুতনায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও মেবারের রানা প্রতাপসিংহ আকবর তথা মুঘলদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেননি। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমরসিংহ ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে মেবারের রানা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পিতার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী না হলেও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও মুঘলদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেননি। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই দ্বিতীয় পুত্র পারভেজ-এর নেতৃত্বে মেবারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই অভিযানের ফলাফল অনিশ্চিত হলে সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রিঃ মহব্বৎ খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মেবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজপুতদের প্রবল বিরোধিতার ফলে এবারও মুঘলদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে ১৬১৬ খ্রি. জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রমের নেতৃত্বে মুঘল সৈন্যবাহিনী মেবার আক্রমণ করে। মুঘল সৈন্যবাহিনী মেবারের গ্রামগুলোতে লুণ্ঠন, অত্যাচার ও ধ্বংসকার্য চালায়। মুঘল বাহিনী মেবার বিধ্বস্ত করতে থাকলে অমরসিংহ বাধ্য হয়ে সন্ধির জন্য প্রার্থনা জানান। মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে এক সম্মানজনক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মেবারের রানা এই প্রথম মুঘল বশ্যতা স্বীকার করেন। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ একে মুঘল-মেবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে করেন। এভাবে মেবারের রাজবংশের সঙ্গে মুঘল

সম্রাটের বিবাদের অবসান ঘটে। মেবারের রানার আনুগত্য লাভে খুশি হয়ে জাহাঙ্গীর অমরসিংহ ও তাঁর পুত্র কিরণসিংহের মর্মর মূর্তি নির্মাণ করে আগ্রা দুর্গে স্থাপন করেন।

বাংলা বিজয়

বাংলায় আফগান শক্তি বিনষ্ট করে আকবর মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু বাংলায় আফগান দলপতিগণ মুঘল সম্রাটের আনুগত্য পুরোপুরি স্বীকার করেননি। বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত কয়েকজন শক্তিশালী জমিদার ও আফগান ওমরাহ বাংলার বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। সম্রাট বিচক্ষণ সুবাদারদের প্রেরণ করা সত্ত্বেও সেসব স্থানে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। কুতুবউদ্দিন খাঁ, কোকা ও জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর পর ইসলাম খাঁকে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। ১৬১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইসলাম খাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মুঘল সৈন্যবাহিনী সোনারগাঁও-এর জমিদার মুসা খাঁ (ঈশা খাঁর পুত্র), সিলেট জেলার বুকাইনগরের আফগান জমিদার ওসমান খাঁ ও যশোরের সামন্তরাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে। এভাবে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

আকবরের মতো জাহাঙ্গীরও দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন। আকবরের সময় আহম্মদনগরের পতন ঘটলেও উক্ত রাজ্য সম্পূর্ণভাবে মুঘলদের অধীন হয়নি। আকবরের মৃত্যুর সময় (১৬০৫ খ্রিঃ) সমগ্র খান্দেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আহম্মদনগরের একাংশ মাত্র মুঘল শাসনাধীনে ছিল। অন্য অংশের স্বাধীন শাসক ছিলেন নিজামশাহী বংশের জনৈক শাহজাদা দ্বিতীয় মুর্তজা নিজাম শাহ। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন মালিক অম্বর। মালিক অম্বর শাসনকার্য, যুদ্ধ পরিচালনা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের হাত থেকে তিনি আহম্মদনগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদনগরের স্বাধীন অংশটি জয় করার উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা পারভেজের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী প্রেরিত হয়। আহম্মদনগরের অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন মন্ত্রী মালিক অম্বর সাফল্যের সঙ্গে বাধা প্রদান করলে মুঘল অভিযান ব্যর্থ হয়। ফলে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা পারভেজের স্থলে শাহজাদা খুর্‌রমকে মুঘল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। মালিক অম্বরের নেতৃত্বাধীন আহম্মদনগর বাহিনীকে এবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তিনি বালাঘাট অঞ্চল ও আহম্মদনগরের দুর্গ মুঘলদের হস্তে সমর্পণ করেন। দাক্ষিণাত্যে সাফল্যের জন্য খুর্‌রমকে সম্রাট জাহাঙ্গীর 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুঘল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে মালিক অম্বর পুনরায় তাঁর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করেন। শাহজাহানকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়। মালিক অম্বর পুনরায় বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। ১৬২৩ খ্রিঃ শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে মালিক অম্বর তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকারের পর মালিক অম্বর পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই মুঘল সৈন্যবাহিনীকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপৃত হতে হয়। ফলে মুঘল সৈন্যবাহিনীকে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরত আনা হয়। এভাবে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য বিজয় প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাংড়া বিজয়

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কাংড়া বা নগরকোট দুর্গ জয়। উত্তর পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর মধ্যবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গটির অবস্থান। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মর্তুজা খানকে কাংড়া দুর্গ অধিকারের জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করা হয়। এই অভিযান ব্যর্থ হলে

শাহজাদা খুর্‌রমের নেতৃত্বে মুঘল সৈন্যবাহিনী দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর অবরোধের পর অবশেষে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত কাংড়া দুর্গ অধিকার করেন।

কান্দাহার নিয়ে পারস্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মধ্যযুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল কান্দাহার। কান্দাহারের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য পারস্যের শক্তিশালী অধিপতিদের সঙ্গে মুঘল সম্রাটদের দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে আকবর কান্দাহার অধিকার করে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক পারস্যের অধিপতি শাহ আব্বাস ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং সুদক্ষ শাসক। আকবরের মৃত্যুর পর তিনি কান্দাহার অধিকারের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কান্দাহার দুর্গ অবরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। অতপর তিনি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করতে থাকেন। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি বিভিন্ন সময়ে জাহাঙ্গীরের নিকট উপহার পাঠান। সম্রাট জাহাঙ্গীর পারস্যের সম্রাটের ব্যবহারে প্রীত হয়ে কান্দাহার দুর্গের সুরক্ষার ব্যাপারে অবহেলা দেখান। শাহ আব্বাস এরূপ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অতর্কিতে কান্দাহার আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই সময় সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাহান বিদ্রোহ করলে সম্রাটকে বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যাপৃত থাকতে হয়। ফলে কান্দাহার মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়।

শাহজাহানের বিদ্রোহ

অতিরিক্ত মদ ও আফিম সেবন করার ফলে শেষ জীবনে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। নুরজাহানই সে সময়ে প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করেন। জাহাঙ্গীরের অবর্তমানে কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন তা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। নুরজাহান এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করলে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। জাহাঙ্গীরের চার পুত্র– খসরু, পারভেজ, খুর্‌রম ও শাহরিয়ার-এর মধ্যে তৃতীয় পুত্র খুর্‌রম (শাহজাহান)ই সকল দিক দিয়ে যোগ্যতম ছিলেন। ইতোমধ্যে খুর্‌রমের ষড়যন্ত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর মৃত্যু ঘটে। কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের সঙ্গে নুরজাহান তাঁর পূর্ব বিবাহজাত কন্যা লাড্‌লী বেগমকে বিবাহ দিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করেন। ইতোমধ্যে পারস্যের শাসক কান্দাহার অধিকার করলে জাহাঙ্গীর শাহজাদা শাহজাহানকে কান্দাহার অভিযানের নির্দেশ দেন। কিন্তু শাহজাহান মনে করেন যে, এতে নুরজাহানের ষড়যন্ত্র রয়েছে। দিল্লি ছেড়ে সুদূর কান্দাহার গেলে পিতাকে (জাহাঙ্গীর) দিয়ে নুরজাহান শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন করিয়ে নেবেন। তাই শাহজাহান পিতার আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে মালিক অম্বরের সাহায্য লাভের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সেখানে কোন সাহায্য না পেলে তিনি উড়িষ্যার পথে বাংলায় এসে রাজমহল অবরোধ করে পাটনায় প্রবেশপূর্বক বিহার অধিকার করেন। সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ ও পারভেজ তাঁর পশ্চাদধাবন করে এলাহাবাদের কাছে পরাজিত করলে শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন।

সেখানে আহম্মদনগরের একাংশের শাসক মালিক অম্বরের সঙ্গে যোগ দেন। পুনরায় মহব্বৎ খাঁ ও পারভেজ তাঁর পশ্চাদধাবন করে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হলে শাহজাহান আত্মসমর্পণ করেন। এবং পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। উদার হৃদয় জাহাঙ্গীর পুত্রস্নেহে শাহজাহানকে ক্ষমা করেন।

সেনাপতি মহব্বৎ খাঁর বিদ্রোহ

শাহজাহানের বিদ্রোহ দমনে মহব্বৎ খাঁর কৃতিত্বে নুরজাহান শঙ্কিত হন। মহব্বৎ খাঁকে শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠতে দেখে নুরজাহান তাঁকে পারভেজের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য বাংলায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। নুরজাহানের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মহব্বৎ খাঁ বিদ্রোহ করেন। নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর কাশ্মির বেড়াতে যাবার পথে ঝিলাম নদীর তীরে সম্রাটের শিবিরে হানা দিয়ে মহব্বৎ খাঁ তাঁদের বন্দি করেন। কিন্তু নুরজাহানের কৌশলে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে উভয়েই পলায়ন করতে সক্ষম হন। রোটাস নামক স্থানে জাহাঙ্গীর উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুচরদের সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ করেন। পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্তন হলে মহব্বৎ খাঁ দক্ষিণাত্যে অবস্থানরত শাহজাহানের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হন। ইতোমধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে শাহজাদা পারভেজের মৃত্যু ঘটে। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মির থেকে ফেরার পথে জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক

আকবরের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় শক্তি পর্তুগিজদের সঙ্গে মুঘলদের পরিচয় ঘটে। এই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জাতি বিশেষত ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ ভারতে আগমন করেছিল। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসেবে ক্যাপ্টেন হকিন্স নামে জনৈক ইংরেজ এক অনুরোধপত্র সহ জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। জাহাঙ্গীর ইংরেজ দূতকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অনুরোধ পত্রের বক্তব্য অনুযায়ী ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। অতপর পর্তুগিজদের প্ররোচণায় ইংরেজ বণিকগণ উল্লেখিত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে এডওয়ার্ডস নামক জনৈক ইংরেজ পুনরায় জেমসের পত্র নিয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। কিন্তু দৌত্য ব্যর্থ হলে ১৬১৫ খ্রিঃ প্রথম জেমসের দূত হিসেবে দরবারে আগমন করেন স্যার টমাস রো। তিনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ। পর্তুগিজদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সফল হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ কোম্পানিকে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপন এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরের দরবারে আগত এসব ইউরোপীয় ব্যক্তি মুঘল যুগের বেশকিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এসব তথ্য থেকে মুঘল দরবারের রীতি-নীতি, আইন-অনুষ্ঠান, সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব

মধ্যযুগে ভারতের মহান সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। মুঘল সংস্কৃতিমনা পরিবারের তাঁর জন্ম। জাহাঙ্গীর তাঁর পিতা আকবর এবং মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুরের মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও মুঘলদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে একেবারে দূরে সরে পড়েননি। তিনি পিতামহের মতো আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে রয়েছে মধ্যযুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। এ গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, মুঘল রাজপরিবারের নিখুঁত ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। তিনি আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত না হলেও বুদ্ধিমান, সংস্কৃতিপরায়ণ, রুচিশীল ও কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এসব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল মদ্যপান ও আফিম সেবন। তবুও তাঁকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ Talented drunkard বলে অভিহিত করেছেন।

সামগ্রিক দিক বিবেচনা করলে জাহাঙ্গীর একজন সফল শাসক ছিলেন। শাসনকার্য স্বয়ং পরিচালনা করতেন। তিনি কারও পরমার্শ গ্রহণ করতেন না। রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জাহাঙ্গীর যে অবিচল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নুরজাহান যখন শাহরিয়ারকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে ব্যর্থ হন। একমাত্র যোগ্য পুত্র খুর্‌রমকে (শাহজাহান) সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে জাহাঙ্গীর ভুল

করেননি। এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তার পরিচিতি মেলে। শিকারে তাঁর অনুরাগ লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট শিকারী। সেনাপতি হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সামরিক অভিযানের যাবতীয় পরিকল্পনা তিনি নিজেই করতেন। ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। বিচারকার্যে তিনি ব্যক্তি ও ব্যষ্টির মধ্যে কোন প্রভেদ করতেন না। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে তিনি রাজ দরবারে ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। যে কেউ সুবিচারের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হতে পারতো। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে জাহাঙ্গীরই সর্বপ্রথম বারটি লিখিত আইন প্রণয়ন করেছিলেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। অপরাধী কঠোর দন্ডে দন্ডিত হতো, তবে প্রাণদন্ড খুব সতর্কতার সঙ্গে দেওয়া হতো। তাতে মনে হয় জাহাঙ্গীর নিষ্ঠুর ছিলেন না। তবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

জাহাঙ্গীরের অন্তর ছিল কোমল। আত্মীয়-স্বজন এমনকি পশুপক্ষীর জন্যও তাঁর দয়া ও মমত্ববোধ লক্ষণীয়। পিতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু পিতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা যা তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকৃত হয়েছে।

আকবরের মতো জাহাঙ্গীর ধর্মের ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও আকবরের মতো তিনি বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা শুনতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু আচরণ করতেন , যার ফলে তাঁর ধর্মনীতি সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেছেন। তিনি হিন্দু যোগীদের সঙ্গ দিতেন। হোলি উৎসবে যোগদান করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্বালামুখী মন্দিরে তাঁর আচরণ ও শিখ গুরু অর্জুন হত্যার ব্যাখ্যা অন্যভাবে হতে পারে। তবে একথা সত্যি যে, কোন ধর্মীয় উম্মাদনায় তিনি শিখ গুরু অর্জুনকে হত্যা করেননি। তিনি মুঘল দরবারের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন বিধায় জাহাঙ্গীর তাঁকে হত্যা করেন। বাস্তবে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। পিতার মতোই তাঁর রাজদরবারে হিন্দুদের মর্যাদা দেন। রাষ্ট্রীয় কার্যে হিন্দুদের অংশগ্রহণে কোন বাধা সৃষ্টি করেননি। মানসিংহ ও অন্যান্য হিন্দু মনসবদারগণ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জাহাঙ্গীর শিল্প ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্পের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি স্বয়ং চিত্রাঙ্কন ও চিত্র সমালোচনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আগ্রার প্রাসাদের দেওয়াল চিত্রের কতকাংশ তিনি নিজে অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে মুঘল চিত্রশিল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করে গৌরবের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। মূলত তাঁর আমলেই মুঘল চিত্রকর্ম সম্পূর্ণ ভারতীয় চরিত্র পায়। সমকালীন ভারতবর্ষ এবং পারস্যের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি ফারসি ও তুর্কি ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। মদ-শিল্প-সাহিত্যকে তিনি একই সঙ্গে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর লেখা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর রাজদরবারে হিন্দি কবি ও বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদদের স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সঙ্গীত শিল্পের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সংক্ষপে বলা যায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর মুঘল রাজবংশের একজন অন্যতম সফল ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি কান্দাহার ছাড়া সর্বত্র পিতার অর্জিত সাম্রাজ্য অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পিতার প্রদর্শিত পথেই প্রজাদের কল্যাণ ও রাষ্ট্রে সুশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন এবং মুঘল শাসনের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। আমরা যেন ভুলে না যাই, ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই রাজত্বকালে স্যার টমাস রো ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দরবারে এসে নতজানু হয়ে সম্রাটের অনুগ্রহ চেয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের রীতিনীতি, ঐশ্বর্য ইংরেজ দূতকে বিস্মিত করেছিল। তাই ঐতিহাসিক ড. বেণীপ্রসাদ যথার্থ বলেছেন, "জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ছিল সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির সূচক। শিল্প ও বাণিজ্য চরম উৎকর্ষ লাভ করে। স্থাপত্যের অগ্রগতি সামান্য বটে, কিন্তু চিত্রশিল্প গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।"

সারসংক্ষেপ

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। রাজ্য বিস্তার, বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য শাসনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সময়ে ইউরোপীয় বণিক বিশেষত ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে আগমন করে। তাঁরা সম্রাটের অনুমতি নিয়ে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায়। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। তাঁর আমলে ভারতে চিত্রকলার প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ছিলেন একজন সুশাসক ও ন্যায় বিচারক। তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.
২. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।
৩. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। জাহাঙ্গীরকে আকবর স্নেহ করে কি নামে ডাকতেন?
(ক) সেখুবাবা (খ) সেলিম বাবা
(গ) জাহাবাবা (ঘ) জহুবাবা।

২। সিংহাসনে বসে সম্রাট জাহাঙ্গীর কয়টি শাসনতান্ত্রিক বিধি জারি করেছিলেন?
(ক) ১৫টি (খ) ১০টি
(গ) ১২টি (ঘ) ২০টি।

৩। কত খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে বিবাহ করেন?
(ক) ১৬০০ খ্রিঃ (খ) ১৬০৫ খ্রিঃ
(গ) ১৬১১ খ্রিঃ (ঘ) ১৬১২ খ্রিঃ।

৪। কোন ইংরেজ রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে সর্বপ্রথম সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন?
(ক) ক্যাপ্টেন হকিন্স (খ) এডওয়ার্ডস
(গ) স্যার টমাস রো (ঘ) উইলিয়াম কেরী।

৫। ধর্মীয় ব্যাপারে জাহাঙ্গীর কেমন ছিলেন?
(ক) গোঁড়া (খ) উদার
(গ) মধ্যপন্থী (ঘ) সংস্কারপন্থী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনতান্ত্রিক বিধিসমূহের বিবরণ দিন।
২। জাহাঙ্গীর কর্তৃক খসরুর বিদ্রোহ দমন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাংলা অভিযানের বর্ণনা দিন।
৪। ইউরোপীয়দের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
৫। শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

রচনামূলক ঃ

১। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্য বিস্তারের একটি বিবরণ দিন।
২। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সংঘটিত বিদ্রোহসমূহের বর্ণনা দিন।
৩। সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৫

শাহজাহান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *শাহজাহানের সিংহাসন-অধিষ্ঠান-উত্তর সমস্যাবলি ও বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *শাহজাহানের রাজত্বকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলি বলতে পারবেন;*
- *শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শাহজাহানের অবদান মূল্যঅয়ন করতে পারবেন;*
- *শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।*

শাহজাহানের রাজত্বকাল প্রায় ত্রিশ বৎসরব্যাপী (১৬২৮-১৬৫৮) বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজত্বকালকে সাধারণত মুঘল শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ আকবর এবং পিতা জাহাঙ্গীর দুজনেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল খুর্‌রম। সম্রাট আকবর নিজে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করে মুঘল রাজপরিবারের একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তার কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম, বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসকিতার পরিচয় পেয়ে পিতা জাহাঙ্গীর তাঁকে বহু যুদ্ধের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মেবার, দাক্ষিণাত্য ও কাংড়া প্রভৃতি অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে জাহাঙ্গীর তাঁকে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬২৭ খ্রি. পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর তীক্ষ্নবুদ্ধি এবং প্রখর বাস্তববোধকে কাজে লাগিয়ে নুরজাহানের সকল চেষ্টা ও দূরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পিতার দেয়া উপাধি 'শাহজাহান' গ্রহণ করে মহাসমারোহে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

শাহজাহানের প্রাথমিক সমস্যা ও বিদ্রোহ দমন

শাহজাহান সিংহাসন আরোহনের পর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হন। শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁকে দু'টি বিদ্রোহ দমন করতে হয়। একটি হলো বুন্দেলখন্ডের রাজপুত নেতা জুঝর সিংহের বিদ্রোহ, অপরটি হলো দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা আমীর খান জাহান লোদির বিদ্রোহ। শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে জুঝর সিংহের বিরুদ্ধে মহবৎ খানের নেতৃত্বে মুঘল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মহবৎ খান জুঝর সিংহকে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। সম্রাট শাহজাহান জুঝর সিংহকে মনসবদার নিযুক্ত করেন কিন্তু ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহ করলে তাঁকে বন্দি করে হত্যা করা হয়।

১৬২৮ খ্রি. দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খান জাহান লোদি আহম্মদনগরের সুলতানের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ করলে সম্রাট শাহজাহান তাঁর বিরুদ্ধে মুঘল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে খান জাহান লোদি পরাজিত হয়ে কালিঞ্জরে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি নিহত হন।

পর্তুগিজ দমন

১৫৭১ খ্রি. সম্রাট আকবরের অনুমতি নিয়ে পর্তুগিজ বণিকগণ বাংলার সাতগাঁও নামক স্থানে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। ক্রমে তারা হুগলীতে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থানান্তরিত করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে তারা দুর্নীতি পরায়ন হয়ে ওঠে। শুল্ক ফাঁকি, কৃষকদের ওপর অত্যাচার, বলপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ এবং মমতাজ মহলের দু'জন ক্রীতদাসী বালিকাকে অপহরণ প্রভৃতি অপকর্মের জন্য সম্রাট শাহজাহান তাদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন। ১৬৩২ খ্রি. কাশিম খার পুত্র এনায়েত উল্লাহ পর্তুগিজ বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলী আক্রমণ করে তাঁদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। অবশ্য ১৬৩৩ খ্রি. শাহজাহান পর্তুগিজদের হুগলীতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন।

শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি

দাক্ষিণাত্য

রাজনৈতিক দিক থেকে শাহজাহানের রাজত্বকাল দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীর ও পিতামহ আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির পথ অনুসরণ করেই দাক্ষিণাত্যে রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে ছিল আহম্মদনগরের নিজামশাহী রাজ্যের অবস্থান। কাজেই শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল আহম্মদনগর রাজ্য। এই সময়ে আহম্মদনগরের সুলতান নিজাম-উল-মুলকের মন্ত্রী মালিক অম্বরের স্বার্থান্বেষী পুত্র ফতে খাঁ ষড়যন্ত্র করে সুলতান দ্বিতীয় মর্তুজাকে হত্যা করেন। অতপর নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তিনি সুলতানের দশ বৎসরের নাবালক পুত্র আহম্মদনগরের সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ১৩৩১ খ্রি. মুঘল সৈন্যবাহিনী আহম্মদনগরের দৌলতাবাদ দুর্গ আক্রমণ করে। ফতে খাঁ মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুঘল বাহিনীর আক্রমণে ফতে খাঁর বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সাড়ে দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করে দৌলতাবাদ দুর্গ মুঘলদের হাতে অর্পণ করে। দৌলতাবাদ দুর্গের পতনের ফলে আহম্মদনগরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় এবং এটি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। নাবালক সুলতান হুসেন শাহ যাবজ্জীবন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি জীবন কাটান। অন্যদিকে ফতে খাঁ মুঘল দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর বিজয়ের পর সম্রাট শাহজাহান বিজাপুর ও গোলকুন্ডা রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ করতে সচেষ্ট হন। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদনগরের নিজাম শাহী বংশকে পুনপ্রতিষ্ঠা করতে শাহুজী চেষ্টা চালালে উল্লেখিত দু'টি রাজ্য শাহুজীকে গোপনে সহযোগিতা করে। এই সংবাদ অবগত হয়ে এদের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য স্বয়ং শাহজাহান ১৬৩৬ খ্রি. দৌলতাবাদে গমন করেন। এবং ৫০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। শাহজাহানের এই উদ্যোগ দেখে গোলকুন্ডার সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহ ভীত হয়ে পড়েন। শাহজাহানকে সার্বভৌম সম্রাট স্বীকার করে বাৎসরিক কর প্রদান করতে সম্রাটের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন সহ স্বীকৃত হন।

কিন্তু বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ সহজে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি ছিলেন না। ফলে শাহজাহান মুঘল সৈন্যবাহিনীকে বিজাপুর আক্রমণের নির্দেশ দেন। বিজাপুর বাহিনী মুঘল বাহিনীকে বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ করে এবং শাহপুর হ্রদের বাধ কেটে রাজধানী প্লাবিত করে মুঘল সৈন্যবাহিনীকে বাধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে উভয় বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এবং এক সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। আদিল শাহ মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। ফলে বিজাপুরের অখন্ডতা বজায় থাকে। উপরন্তু আহম্মদনগরের পঞ্চাশটি পরগনা বিজাপুরের সুলতান লাভ করেন। অন্যদিকে বিজাপুরের সুলতান ২০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মুঘল সম্রাটকে প্রদান করেন। এসঙ্গে শাহুজীকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। শাহজাহান ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে ১৮ বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গনা ও দৌলতাবাদ– এই চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। মুঘল সম্রাটগণ সেখান থেকে বৎসরে কয়েক কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করতেন।

শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ড় নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস কান্দাহার অধিকার করে নিয়েছিলেন (১৬২৩ খ্রি.)। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি এজন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি কান্দাহারের তৎকালীন শাসনকর্তা আলী মর্দানকে প্রভুত অর্থ দ্বারা বশ করে কান্দাহার অধিকার করেন। আলী মর্দান দিল্লিতে চলে আসেন। তিনি মুঘল দরবারে অভাবনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। তাঁকে কাশ্মির ও কাবুলের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

মাত্র দশ বছর কান্দাহার মুঘল অধিকারে ছিল। ১৬৪৮ খ্রি. পারস্যের শাহ আব্বাস কান্দাহার অবরোধ করেন। শীতকালে তুষারপাতের ফলে শাহজাহান যথাসময়ে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করতে না পারায় মুঘল

বাহিনী কান্দাহার রক্ষা করতে পারেনি। মুঘল শাসনকর্তা দৌলত খাঁ পারস্য বাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়ে কান্দাহার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতপর শাহজাহান ১৬৪৯, ১৬৫২ এবং ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুঘল বাহিনী কান্দাহার পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন।

শাহজাহানের মধ্য এশিয় নীতি

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার পর শাহজাহান মধ্য এশিয়া পুনঅধিকারের সংকল্প গ্রহণ করেন। বল্‌খ এবং বাদাখ্‌শান বিজয়ের উদ্দেশ্যে ১৬৪৬ খ্রি. যুবরাজ মুরাদ এবং আলী মর্দানকে মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করেন। এই অভিযান সাফল্যমন্ডিত হয়। তাঁরা বল্‌খ ও বাদাখসান অধিকার করে নেন। কিন্তু কিছুকাল পর সেখানকার আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুরাদ আগ্রায় ফিরে আসেন। মুরাদের প্রত্যাবর্তনের পর শাহজাহান প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাকে বল্‌খ-এ প্রেরণ করেন। ১৬৪৭ খ্রি. তাকে সাহায্য এবং নব বিজিত স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে এক বিশাল সেনা বাহিনী সহ শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ উজবেগদের পদানত করে রাখতে পারেনি। আওরঙ্গজেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি বল্‌খ ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারে রাজকোষের প্রভুত অর্থ ব্যয় এবং বিপুল সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে।

শাহজাহানের রাজত্বকালে উত্তরাধিকার যুদ্ধ

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সম্রাটের মৃত্যু ঘটেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁর পুত্রদের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। অথচ শাহজাহান তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে সম্ভবত জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে ভুল করেন। এই ভুলই উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বকে অনিবার্য করে তোলে। শাহজাহানের পুত্ররা এই সময়ে বয়প্রাপ্ত এবং শাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য ছিল।

দারাশিকোহ

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোহ ছিলেন শাহজাহানের সবচেয়ে প্রিয়। তিনি ছিলেন পাঞ্জাব, মুলতান ও এলাহাবাদের শাসক। কিন্তু তিনি সর্বদা পিতার নিকটে থেকে প্রতিনিধির মাধ্যমে উক্ত প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম সম্পর্কে উদার। উপনিষদ, বাইবেল এবং সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকদের রচনার সাথে তাঁর পরিচিতি ছিল খুবই ঘনিষ্ট। তিনি হিন্দু পন্ডিতদের সাহায্যে ফারসি ভাষায় অথর্ব বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর ধর্মীয় নীতির প্রধান লক্ষ্য।

সুজা

শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। ব্যবহার অমায়িক হলেও তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল নিম্মানের। কিন্তু মদ এবং নারীর প্রতি আসক্তি তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনে। যদিও কোন প্রকার গোঁড়ামি, ভন্ডামী অথবা সহজাত দুষ্টবুদ্ধি তাঁর ছিল না।

আওরঙ্গজেব

শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসক। ভ্রাতাদের মধ্যে তিনি যেমনি ছিলেন বিদ্বান, সাহসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ তেমনি ছিলেন কূটনীতিজ্ঞ এবং দূরদর্শী। তাঁর মধ্যে সামরিক প্রতিভা ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিভারও অভাব ছিল না। সুজাও দক্ষ ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মতো একটানা কঠোর পরিশ্রমে উৎসাহ ও দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। সরল জীবনযাত্রা, সৌজন্য ও প্রিয়ভাষিতা এবং শৃঙ্খলা পরায়ণতার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট এবং তিনি অবিচল থাকতেন তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য।

মুরাদ

শাহজাহানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক। তিনি সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন; কিন্তু চিন্তা-ভাবনা, ভয়, কপটতা, সংযম-ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর ছিল না। মদ ও নারীর প্রতি সুজার মতো তাঁরও আসক্তি ছিল। আওরঙ্গজেবের কূটনীতি বোঝার মতো ক্ষমতা তার ছিল না।

জাহানারা ও রৌশনারা

দরবারের রাজনীতিতে বিশেষত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সময় শাহজাহানের দুই কন্যার ভূমিকা লক্ষণীয়। জাহানারা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার পক্ষ নেন এবং রৌশনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করেন।

সম্রাট শাহজাহান যখন অসুস্থ হন তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পিতার কাছে আগ্রায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময় সুজা বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটে ছিলেন। স্বভাবতই দারা পিতার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে শাসনভার গ্রহণপূর্বক তিন ভাইয়ের আগ্রা আগমনের পথ বন্ধ করে দেন। এমন কি রাজধানী থেকে কোন সংবাদ যাতে ভাইদের নিকট পৌঁছাতে না পারে সে ব্যবস্থাও করেন। সম্ভবত শাহজাহান রোগশয্যায় দারাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ভগ্নী রৌশনারা মারফত আওরঙ্গজেব সংবাদ পান যে, পিতা শাহজাহান অসুস্থ, দারা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। এই সংবাদ পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিন ভ্রাতাই মনে করেন যে, তাঁদের পিতা আর জীবিত নেই এবং দারা সিংহাসনে বসার জন্য এই সংবাদটি গোপন করেছেন। এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে তিন ভ্রাতাই দারাকে পরাস্ত করে সিংহাসন অধিকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমেই সুজা বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা দেন। অতপর তিনি বিহার অধিকার করে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন। এদিকে মুরাদ গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব অপর দুই ভাইয়ের মতো কোনরূপ ঘোষণা না দিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। সুজা আগ্রা অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন এ সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৪ এপ্রিল, ১৬৫৮ খ্রি. দিপালপুরে মুরাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তিনি মুরাদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। স্থির হয় যে, তাঁরা দুজনে দারা ও সুজার বিরুদ্ধে মিলিতভাবে যুদ্ধ করবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হবার পর মুঘল সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন।

তিন ভ্রাতার রাজধানী অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হবার সংবাদ পেয়ে দারা পুত্র সুলেমানের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী সুজার বিরুদ্ধে পাঠান। সুলেমানের অধীনস্থ মুঘল বাহিনী সুজার সৈন্যবাহিনীকে বারাণসীর নিকট বাহাদুরপুরের যুদ্ধে পরাজিত করে (ফেব্রুয়ারি, ১৬৫৮ খ্রি.)। সুজা বাধ্য হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। দারা যশোবন্ত সিংহ এবং কাশিম খাঁর নেতৃত্বে অপর এক সেনাবাহিনী আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যশোবন্ত সিংহ এবং কাশিম খাঁর মধ্যে মতানৈক্যের জন্য

আওরঙ্গজেব এই বাহিনীকে উজ্জয়িনীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ধর্মাট নামক স্থানে পরাজিত করতে সক্ষম হন (এপ্রিল, ১৬৫৮)। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আওরঙ্গজেবের সামরিক খ্যাতি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আওরঙ্গজেব ও মুরাদের বিজয়ী বাহিনী আগ্রার নিকটবর্তী সামুগড় নামক স্থানে উপস্থিত হয়। দারা প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে দারা আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। উল্লেখ্য যে, দারার সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় শত্রুপক্ষীয় সৈন্যেবাহিনীর সমান হলেও শৃঙ্খলার অভাব ছিল। তা সত্ত্বেও দারা নিজে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। তরুণ রামসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতরা বীরত্বের সাথে প্রাণপণে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের নিপুণ রণকৌশলের নিকট দারা সামুগড়ের যুদ্ধে (মে, ১৬৫৮) পরাজিত হন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দারা পাঞ্জাবে পলায়ন করেন। আওরঙ্গজেব অবিলম্বে আগ্রায় উপস্থিত হয়ে আগ্রা দুর্গ অবরোধ করেন। বৃদ্ধ শাহজাহানের সমস্ত প্রতিরোধ ও আপোষ রফার অনুরোধ উপেক্ষা করে আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করেন। পিতা শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে নজরবন্দি করে রাখেন।

আগ্রা থেকে আওরঙ্গজেব দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মথুরার কাছে তিনি কৌশলে মুরাদকে বন্দি করেন। প্রথমে সলিমগড় দুর্গে পরে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রাখেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান আলী নকীকে হত্যার অভিযোগে আওরঙ্গজেবের আদেশে মুরাদকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সুজা বারাণসীর কাছে দারার পুত্র সুলেমানের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয়ের ফলে সুলেমান আর সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে পারলেন না। ইতোমধ্যে সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে শক্তিবৃদ্ধি করেন। আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে আওরঙ্গজেব সুজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। অতপর আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা সুজার পশ্চাদধাবন করলে তিনি বাংলা ত্যাগ করে আরাকান অঞ্চলে পালিয়ে যান। এরপর সুজার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় যে, আরাকান রাজের আদেশে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

এদিকে দারা পাঞ্জাব থেকে পারস্য অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিনি জিওন খাঁ নামক এক আফগান সর্দারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জিওন খাঁকে একসময় দারা শাহজাহানের প্রাণদন্ডাদেশ হতে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ জিওন খাঁ অর্থলোভে দুই কন্যা, নাবালক পুত্র ও স্ত্রী সহ দারাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পণ করেন। বন্দি অবস্থায় দারাকে দিলি-তে নিয়ে আসা হয় এবং প্রকাশ্য রাজপথে তাঁকে চরম অবমাননা করা হয়। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব দারাকে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করে সিংহাসন লাভে নিশ্চিত হন। এইভাবে চরম রক্তাক্ত পরিণতির মধ্যদিয়ে আওরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট শাহজাহান দীর্ঘকাল বন্দি অবস্থায় আগ্রা দুর্গে অতিবাহিত করে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ও সংঘর্ষে নিম্নলিখিত কারণে আওরঙ্গজেব সাফল্য লাভ করেছিলেনঃ

প্রথমত, আওরঙ্গজেব অসাধারণ দূরদর্শী, সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী ইসলামী মতবাদে বিশ্বাসী। ফলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল।

দ্বিতীয়ত, শাহজাহানের দুর্বলতা এবং সিদ্ধান্তহীনতা আওরঙ্গজেবের সাফল্যের অন্যতম কারণ। পুত্রদের রাজধানী অভিমুখে যাত্রার সংবাদ পেয়ে শাহজাহানের উচিত ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু তিনি তা না করে বিদ্রোহী পুত্রদের স্পর্ধা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন এবং দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, আওরঙ্গজেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে অপরাপর ভ্রাতাদের অসতর্কতাও আওরঙ্গজেবের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। বিপদের সময় সাহসিকতা এবং কূটনৈতিক জ্ঞানে কোন ভ্রাতাই

আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। গোলন্দাজ বাহিনীর সাফল্যই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেছিল।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে, দারার অধীনস্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্যের অভাবের ফলে দারাকে বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অপরদিকে আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী ছিল সুসংঘবদ্ধ ও একক নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত। এইরূপ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধে জয়ী হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা।

স্থাপত্য শিল্পে শাহজাহানের অবদান

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মুঘল ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ যুগে ভারতে সকল দিক দিয়ে চরম উন্নতি ঘটেছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্যের দিক দিয়েও ভারত গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষে জন্যই ঐতিহাসিকগণ শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার শাহজাহানের রাজত্বকালকে Age of grandeur বলেও চিহ্নিত করেছেন। শাহজাহান ছিলেন একজন মহান স্থপতি এবং শাহজাহানকে তাই The prince of builders বলে অভিহিত করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের আমলে যেমন চিত্রশিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তেমনি শাহজাহানের আমলে স্থাপত্য শিল্পে মণি-মানিক্যাদির ব্যবহার মুঘল যুগের স্থাপত্য রীতিকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ নতুন এক স্থাপত্য রীতির রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতপক্ষে, শাহজাহান তাঁর স্থাপত্য শিল্পে রঙের আতিশয্য ও আড়ম্বরকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হুমায়ুনের সমাধিভবন, ফতেপুরসিক্রীতে নির্মিত সৌধগুলো আকবরের সমাধি ভবন এবং নুরজাহানের পিতা ইতিমদ উদ্দৌলার সমাধি ভবন ইন্দো পারসিক স্থাপত্য রীতির নিদর্শন। আকবর স্থাপত্য শিল্পে যে সমন্বয় ও ভারতীয়করণের রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, তা ম্লান হয়ে যায়। শাহজাহানের আমলে বিদেশী স্থাপত্য শিল্পের আড়ম্বর ও অতি অলংকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে শিল্প সমালোচকগণের মতে প্রাক-শাহজাহানের শিল্পসৌধগুলো মজবুত ও আভিজাত্যপূর্ণ শিল্পসুষমামন্ডিত। কিন্তু শাহজাহানের আমলে নির্মিত সৌধগুলো শৌখিন কিন্তু দুর্বল। শাহজাহান যে একজন দরদী ও মরমী শিল্পীর মন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সৌধ নির্মাণে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ব্যবহৃত লাল বেলে পাথরের পরিবর্তে শাহজাহান সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহার করেন। সাদা পাথরের ব্যবহার ঘটিয়ে শাহজাহান ভারতীয় স্থাপত্যরীতিকে এক অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী করেছিলেন। শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলো আগ্রা, দিল্লি ও লাহোর দুর্গের অভ্যন্ড়রে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া কাবুল, কাশ্মির, কান্দাহার ও আজমীর সর্বত্রই তিনি অনুপম প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যান নির্মাণ করেন। অনেক শিল্প সমালোচক বলেছেন, মৌলিকতার দিক থেকে শাহজাহানের নির্মিত সৌধগুলো আকবর নির্মিত সৌধগুলো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হলেও আড়ম্বর ও বহুমূল্য অলংকরণের দিক থেকে এগুলো শ্রেষ্ঠ ছিল। বিশেষ করে দিলি- তে 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মতি মসজিদ, 'জামি মসজিদ' এবং 'শিসমহল' শাহজাহানের অনবদ্য শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন। আগ্রা দুর্গেও অনুরূপভাবে নির্মিত তাঁর জীবনের প্রথমদিকের সৌধগুলো স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ট নিদর্শন। এখানে নির্মিত বিশেষ করে 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মতি মসজিদ', 'মুসাম্মন বাজ', 'শিস মহল' শাহজাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য সৌধ হিসেবে বিবেচিত।

শাহজাহানের বিখ্যাত পরিকল্পনার মধ্যে দিল্লির অনতিদূরে নতুন প্রাসাদ-দুর্গসহ 'শাহজাহানাবাদ' নামে রাজধানী শহর প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন এবং ১৬৪৮ খ্রি. শেষ করেন। আগ্রা থেকে এখানেই তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেন। এই দুর্গের অভ্যন্তরেই রাজপরিবারের বাসস্থান, হারেম, রাজদরবার, বাগিচা প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। আগ্রা দুর্গের অনুকরণে 'লালকেল্লা' নির্মাণ করা হয়। লাল বেলেপাথরের তৈরি সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই প্রাসাদের বিশালতা আজও

বিশ্বের স্থাপত্যবিদদের কাছে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এমনকি এই বিশাল মুঘল স্থাপত্যটি শাহজাহানের শাসনকালে যেভাবে উদ্ধত অহংকার ও গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আজ আধুনিক ভারতবর্ষেও তা অক্ষত আছে।

শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পের আর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো– 'ময়ুর সিংহাসন'। পারস্যের বিখ্যাত শিল্পী বেবাদল খাঁ এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই সিংহাসনের বাহন ছিল রত্নখচিত ময়ুর। সিংহাসনের মাথায় ছিল পৃথিবী বিখ্যাত কোহিনূর হীরা ও রত্নখচিত রাজছত্র; মুক্তো দিয়ে তৈরি অকৃত্রিম আঙ্গুরের থোকা ঝুলতো এবং মনে হতো ময়ূরেরা সেগুলো ছিড়ে খাচ্ছে। এ এক অভূতপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্য। দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ এই মহামূল্যবান ময়ূর সিংহাসনটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত স্থাপত্য শিল্পের মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে তাজমহল। শুধু মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ আগ্রার তাজমহল। শিল্প সৃষ্টির দিক দিয়ে এটি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে মমতাজের মৃত্যুর পর যমুনা নদীর তীরে শাহজাহান তাঁর প্রেমকে কালজয়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক লাহোরীর মতে, এই সৌধ নির্মাণ করতে বারো বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু ট্যাভার্নিয়ের মতে, বাইশ বছর ধরে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এই সৌধ নির্মিত হয়েছিল।

শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্প ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির এক অনবদ্য সৌন্দর্যের প্রতীক। ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির এমন অনুপম সৌন্দর্য ইতোপূর্বে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য রীতিতে কখনও প্রতিফলিত হয়নি। যদিও 'হুমায়ুনের সমাধি' ও 'ইতিমদ উদ্দৌলার সমাধি' ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; কিন্তু ইতিমদ উদ্দৌলার সমাধির শিল্পনৈপুণ্যে রাজপুত শিল্পশৈলীর ছাপ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। শাহজাহানের শিল্পরীতিতে স্বদেশী বা বিদেশী ভাবধারার প্রবেশ নিয়ে যে প্রশ্নই উঠুক না কেন, সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, শাহজাহানের সময়েই মুঘল স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটে।

শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন মহান মুঘল শাসক। তাঁর রাজত্বকাল মুঘল ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' নামে খ্যাত। শাহজাহানের চরিত্রের মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পুত্রবাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একজন সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। একদিকে যেমন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে দাক্ষিণাত্য থেকে রাজস্থান পর্যন্ড় তার তরবারি একদিন ঝলসে উঠেছিল, অপরদিকে তেমনি হাজার হাজার শিল্পীর তুলিতে নানা বাহারের রং ঢেলে দিয়ে স্থাপত্য শিল্পে যে সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেজন্য তাঁকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের সাধক বলে অভিহিত করা যায়।

সিংহাসনে আরোহণকালে শাহজাহানকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তীতে একজন যোগ্য শাসকের পরিচয় দিয়েছিলেন। উপরন্তু মধ্যযুগের আলোকে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করলে তাঁকে দোষী করা যায় না। কারণ, সে যুগে নিজের সিংহাসনকে সুরক্ষিত করতে হলে শাহজাদার পক্ষে অপরকে বাঁচিয়ে রাখার কোন উপায় ছিল না। তিনি নুরজাহানের মতো কূটকৌশলী নারীর সকল চেষ্টা ও দূরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিয়ে সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শাহজাহান তাঁর মহান পিতামহ আকবরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আকবরের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বৎসর বয়স থেকে বিখ্যাত পারসিক পন্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করে শাহজাহান প্রকৃত বিদ্বানে পরিণত হন। আরবি, ফারসি ও হিন্দিতে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি মনোযোগ সহকারে যুদ্ধবিদ্যা শেখেন এবং যৌবনে একজন সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হন। দাক্ষিণাত্য ও মেবার তাঁরই নেতৃত্বে পিতা জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁর এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পিতা

জাহাঙ্গীর কর্তৃক 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত হন। শাহজাহানের রাজদরবার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কবি, দার্শনিক পন্ডিত ও শিল্পীরা রাজদরবারে যথারীতি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী সকলকেই তিনি পুরস্কৃত করতেন। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, নৃত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভালবাসতেন এবং সুন্দর দাস, চিন্ড়মনি ও করীন্দ্র আচার্য প্রমুখ হিন্দু কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রাজকীয় সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে তানসেনের জামাতা লাল খান তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। শাহজাহান কর্তৃক কবি জগন্নাথ 'মহাকবি রাই' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ হয়েছিল। এমনকি বৃন্দাবনের গোকুলস্থ গোঁসাইরা শাহজাহানের সময় তাঁর নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থা ভোগ করেন। উপরন্ড়ু তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় আবদুল হামিদ লাহোরী 'পাদশাহনামা' ও 'শাহজাহাননামা' নামক দুইটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে সমকালীন ইতিহাসের অমূল্য ভান্ডার উপহার দিয়েছেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ সকল দিক দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। তাঁর শাসনকালে মুঘল রাজকোষ ছিল পূর্ণ। শাহজাদা আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য সুবায় টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রয়োগ করে মুঘল রাজকোষে প্রভুত অর্থ প্রেরণ করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য অভাবনীয় রূপে বিকাশ লাভ করেছিল। সুরাট তখন বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই সময়েই ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। এই বাণিজ্যে ভারতের পণ্যই রপ্তানি হতো এবং রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হতো। তাঁর রাজত্বকালে কৃষি ও কৃষকের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়।

শাহজাহান ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক, বিজেতা এবং সুষ্ঠু বিচারক। তিনি তাঁর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উচ্চপদে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করতেন। 'মনসবদারি' ব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যবস্থার বহু ত্রুটি দূর করে শাসনব্যবস্থাকে তিনি গতিশীল করেন। ইউরোপীয় পর্যটক মানুচি শাহজাহানের সুবিচারের প্রশংসা করেছেন। ফরাসি পর্যটক ট্যাভার্নিয়ে শাহজাহানের শাসনকে প্রজার ওপর রাজার শাসন না বলে পিতার শাসন বলাই শ্রেয় বলে মন্তব্য করেন।

সারসংক্ষেপ

১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথমেই বুন্দেলখন্ডের রাজপুত নেতা জুঝার সিংহের বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যের শাসক খান জাহান লোদির বিদ্রোহ এবং পর্তুগিজ বণিকদের দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করেন। অতপর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর, গোলাকুন্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করে সফলতা লাভ করেন। এ সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে সামরিক অভিযান প্রেরণ করে তাঁর পূর্ব পুরুষদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি অক্ষুন্ন রাখেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে আওরঙ্গজেব জয়ী হয়ে দিল্লির সম্রাটকুপে অধিষ্ঠিত হন। শাহজাহানের আমলে স্থাপত্য শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ছিলেন একজন সুশাসক, বিজেতা ও সুবিচারক। তাঁর রাজদরবার ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। তাঁর শাসনকাল মুঘল ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে খ্যাত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Ishwariprasad, *A Short History of Muslim Rule in India, Allahabad 1970.*
২। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা ১৯৮৮।
৩। এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শাহজাহান কত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন–
(ক) প্রায় চল্লিশ বছর (খ) প্রায় ত্রিশ বছর
(গ) প্রায় কুড়ি বছর (ঘ) প্রায় পনর বছর।

২। শাহজাহান সিংহাসনে কত খ্রি. অধিষ্ঠিত হন–
(ক) ১৬২৮ (খ) ১৬১৮
(গ) ১৬৩৮ (ঘ) ১৬৪৮।

৩। উত্তরাধিকার যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিলেন?
(ক) দারা (খ) মুরাদ
(গ) সুজা (ঘ) আওরঙ্গজেব।

৪। শাহজাহানের কন্যা জাহানারা তাঁর কোন ভ্রাতাকে সমর্থন করেছিলেন?
(ক) আওরঙ্গজেব (খ) মুরাদ
(গ) সুজা (ঘ) দারা।

৫। শাহজাহান কত খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৬৫৬ (খ) ১৬৬৬
(গ) ১৭৬৬ (ঘ) ১৬৪৬।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর অধিকারের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২। মধ্যএশিয়া অধিকার করতে শাহজাহান কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার বিবরণ দিন।
৩। শাহজাহানের পুত্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিন।
৪। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
৫। শাহজাহানের আমলেনির্মিত শিল্প নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি বর্ণনা করুন।
২। আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ উল্লেখপূর্বক সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণ দিন।
৩। স্থাপত্য শিল্পে শাহজাহানের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
৪। শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

পাঠ - ৬

আওরঙ্গজেব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আওরঙ্গজেবের রাজ্য বিস্তার নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *তাঁর রাজপুতনীতি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *তাঁর ধর্মীয় নীতি আলোচনা করতে পারবেন;*
- *তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।*

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে মুহীউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব এবং দক্ষতার দিক দিয়ে আওরঙ্গজেব মুঘল সম্রাটদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একমাত্র মহান সম্রাট আকবর ছাড়া তাঁর মতো কোন কর্মদক্ষ সম্রাট মুঘল সিংহাসন আরোহণ করেননি। তিনি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। উত্তরাধিকারী যুদ্ধে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ধর্মাট ও দ্বিতীয় সামুগড়ের যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে গৃহবন্দি করেন। এরপর আগ্রা অধিকার করে সেখানে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করে নিজেকে ভবিষ্যত মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। অতপর খাজওয়া ও দেওয়াই যুদ্ধে দারাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে পুনরায় অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এসঙ্গে গ্রহণ করেন 'আলমগীর বাদশাহ গাজী' উপাধি। আওরঙ্গজেব প্রায় অর্ধশতাব্দী ভারতবর্ষ শাসন করেন। তাঁর শাসনকালকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়– প্রথমার্ধে ১৬৫৮–১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ১৬৮১–১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে, আওরঙ্গজেবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় দক্ষিণ ভারতে। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি আর উত্তর ভারতে ফিরে আসেননি। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য বিস্তার

উত্তর-পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ

মহামতি আকবর যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন আওরঙ্গজেব তা তাঁর সময়ে অব্যাহত রাখেন। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মূলত সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটে। তাঁর পূর্বে কোন শাসকই এত বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পারেননি। উত্তর-পূর্ব ভারতের হিন্দুরাজ্য কুচবিহার ও অহোম রাজ্য অভিযান ছিল আওরঙ্গজেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই দু'টি রাজ্য প্রাকৃতিক দিক থেকে সুরক্ষিত হওয়ায় মুসলিম শাসকগণ এদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে

বিহারের শাসনকর্তা দাউদ খাঁ পালামৌ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এ বৎসর বাংলার শাসনকর্তা মীর জুমলাকে অহোম, কোচ ও আরাকানী মগদের বিরুদ্ধে সম্রাটের নির্দেশ পেয়ে ১৬৬১ খ্রিঃ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঢাকা থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কুচবিহার অধিকার করেন। অতপর মীর জুমলা সৈন্যবাহিনী নিয়ে পরের বৎসর মার্চ মাসে অহোমের রাজধানী গড়গাঁ গিয়ে উপস্থিত হন। অহোমরাজ জয়ধ্বজ রাজধানী থেকে পালিয়ে গিয়ে শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। কিন্তু অচিরেই বর্ষা নামলে মুঘল সৈন্যরা আসামের জলবাহিত নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে এক বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়। এই সুযোগে অহোমের রাজকীয় সৈন্যরা মুঘল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে মুঘল সৈন্যবাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মুঘল সৈন্যবাহিনীর জয়লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে মীর জুমলা অহোমরাজের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বার্ষিক কর এবং দারাং প্রদেশের অর্ধেক মুঘলদের দিতে বাধ্য হয়। এই অভিযানে মুঘলদের বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আসামে অবস্থানকালে মীর জুমলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বন্যা ও বর্ষার প্রকোপে আসাম থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পথে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলা মৃত্যুবরণ করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খানকে (আসফ খাঁর পুত্র) দাক্ষিণাত্য থেকে সরিয়ে এনে বাংলার শাসনকর্তা (সুবাদার) পদে নিয়োগ দান করেন। শায়েস্তা খান দীর্ঘ ত্রিশ বছর এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি পর্তুগিজ ও আরাকানী মগ জলদস্যুদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাংলার নৌশক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৬৬৫ খ্রি. মগ জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি সন্দ্বীপ দখল করেন। পরের বছর (১৬৬৬ খ্রি.)আরকান রাজ্যের হাত থেকে চট্টগ্রামকে অধিকার করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার মানুষকে মগ ও পর্তুগিজদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সমস্যা চিরকালই ভারতের মধ্যে যুগের শাসকদের ব্যাপৃত করে রেখেছিল। শুধুমাত্র মুঘল যুগে নয়, সুলতানি যুগেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শাসকদের মাথা ব্যাথার কারণ ছিল। উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। সেই কারণেই ঐ অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপলব্ধি থেকেই সকল সময়েই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সকল শাসককে গ্রহণ করতে হয়েছিল। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতিতে 'অগ্রসর নীতি' অবলম্বন করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করেন। ঐ অঞ্চলের আফগান উপজাতীয় লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রায়ই উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে অত্যাচার ও লুটতরাজ করতো। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'ইউসুফজাই' নামক এক উপজাতি 'ভাগু' নামে এক অধিনায়কের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়ে আটক ও হাজারা জেলা আক্রমণ করে। সম্রাট তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট মুঘল সেনাপতি আমিন খাঁ ও কামিল খাঁকে 'ইউসুফজাই' উপজাতিদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। দুই সেনাপতি উপজাতীয় বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন এবং দলপতিদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে জামরূদ দুর্গের অধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করে এই অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিদি ও খাটক নামক উপজাতির লোকেরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আফ্রিদিদের নেতা আকমল খাঁ নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা দিয়ে খাটকদের মুঘলদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। তাঁদেরকে দমন করার জন্য সম্রাট সেনাপতি আমিন খাঁকে প্রেরণ করেন। আমিন খাঁ আফ্রিদি নেতা আকমল খাঁর নিকট পরাজিত হলে সম্রাট আওরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ হয়ে সেনাপতি মহব্বৎ খাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু মহব্বৎ খাঁ যুদ্ধের পরিবর্তে আপোষ নীতির মাধ্যমে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চালালে আওরঙ্গজেব সুজাত খাঁর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী বিদ্রোহী আফ্রিদি উপজাতিদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সুজাত খাঁ সহ বহু মুঘল সৈন্য বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন এবং অনেক সৈন্য বন্দি হয়। আফ্রিদি উপজাতির এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে খাটক উপজাতীয় নেতা কবি খুশ্হল খাঁ আফ্রিদি নেতা আকমল খাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁরা আফগান ও পাঠান জাতিকে একত্রিত হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে এক

সার্বজনীন জাতীয় অভ্যুত্থানের আহ্বান জানান। এদের দমন করবার জন্য সম্রাট পরপর ফরিদ খাঁ ও মহব্বৎ খাঁকে প্রেরণ করে ব্যর্থ হন। মুঘল সৈন্য ও সেনাপতিগণ উপর্যুপরি ব্যর্থ হওয়ার ফলে সম্রাট নিজেই সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সসৈন্যে পেশোয়ারের নিকটবর্তী হাসান আবদালে উপস্থিত হন। তিনি একই সঙ্গে কূটনীতি ও সামরিক নীতির দ্বারা বিদ্রোহী উপজাতিদের দমন করতে কৃতকার্য হন। তিনি বিদ্রোহীদের কয়েকটি জায়গীর, অর্থ ও উচ্চপদ উপহার দিয়ে তাঁদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। খাটক ও ইউসুফজাই উপজাতীয় নেতাদের পুত্রদ্বয় মুঘলদের পক্ষে যোগদান করে। বিদ্রোহীপন্থী অন্যান্যদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব রাজধানী দিল্লিতে ফিরে আসেন।

আওরঙ্গজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করলেও তা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়েছিল। প্রথমত, এই যুদ্ধের ফলে মুঘল রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সীমান্ত অঞ্চল থেকে মুঘল সৈন্য সংগ্রহের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘল সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশকে স্থানান্তরিত করার ফলে শিবাজীর পক্ষে মুঘল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সহজসাধ্য হয়েছিল। বস্তুত, ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী দেড় বৎসরের মধ্যে শিবাজী গোলকুন্ডা, বিজাপুর, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেবের রাজপুতনীতি

সম্রাট আকবর ছিলেন প্রকৃত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে রাজপুতদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। তিনি রাজপুতগণের সঙ্গে মিত্রতাসুলভ আচরণ করেন এবং তাঁদের সহায়তা লাভে সমর্থ হন। আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য যে গৌরবের শিখরে আরোহণ করে তা বহুলাংশে রাজপুতদের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভেই সম্ভবপর হয়েছিল। আকবরের বিচক্ষণ এবং সার্থক রাজপুতনীতির আমুল পরিবর্তন ঘটে তাঁর প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। রাজপুত বন্ধুত্বের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হয়ে আওরঙ্গজেব অত্যাচার ও উৎপীড়নের নীতি গ্রহণ করেন।

১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে মাড়োয়ারের রাজা যশোবন্ত সিংহ মুঘল সেনাপতি হিসেবে আফগানিস্তান সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আওরঙ্গজেব মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করতে অগ্রসর হন। মাড়োয়ার রাজ্যটি সামরিক এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে রাজপুতনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ছিল। এসব কারণে আওরঙ্গজেব মাড়োয়ার অধিকার করতে চেয়েছিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের আকস্মিক মৃত্যু আওরঙ্গজেবকে তাঁর উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার সুযোগ এনে দেয়। আওরঙ্গজেব প্রথমে মাড়োয়ার রাজ্যটি খালিসার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পরে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সচেষ্ট হন। তিনি ৩৬ লক্ষ টাকা নজরানার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহের জনৈক আত্মীয় ইন্দ সিংহকে মাড়োয়ার সিংহাসনে বসান। কিন্তু এ সময়ে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর ছয় মাস পর কাবুলে তাঁর দুই রাণীর গর্ভে দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। এতে আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মাড়োয়ারের রাণীদ্বয় নবজাত পুত্র অজিত সিংহকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হন। এবং মাড়োয়ারের সিংহাসনে যশোবন্ত সিংহের পুত্রকে অধিষ্ঠিত করার দাবি জানালে আওরঙ্গজেব অজিত সিংহকে মুঘল হারেমে রেখে লালন-পালন করার শর্তারোপ করেন। কিন্তু দুর্গাদাস নামে এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাঠোর নেতা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি কৌশলে যশোবন্ত সিংহের দুই রাণী ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল হারেম থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে যৌধপুরে নিয়ে যান। আওরঙ্গজেবের আচরণে রাঠোররা ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং দুর্গাদাসের নেতৃত্বে অজিত সিংহকে মাড়োয়ারের রাজা বলে ঘোষণা করে। তখন আওরঙ্গজেব নিজ পুত্র আকবরকে দুর্গাদাসের

বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি স্বয়ং আজমীরে গিয়ে মুঘল সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুঘল বাহিনী ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে যৌধপুর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর এই আক্রমণাত্মক নীতিতে মাড়োয়ারের রাঠোরদের সঙ্গে মেবারের রাজা রাজসিংহ-এর ঐক্য স্থাপিত হয়। মেবারের রাজপরিবারের সঙ্গে মাড়োয়ার রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। মেবার বহুদিন মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিল। মেবারের রাজা রাজসিংহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক জিজিয়া কর পুনপ্রবর্তনে বিরক্ত হয়েছিলেন। এরপর যখন আওরঙ্গজেব মাড়োয়ার রাজ্য আক্রমণ করেন তখন রাজসিংহ রাঠোরদের সাহায্যে অগ্রসর হন। রাঠোর ও মেবারের রাজার এই ঐক্য রাজপুত ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মিলিত শক্তির নিকট শাহজাদা আকবর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন।অতপর আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র আজমকে মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রাজপুতদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন।

শাহজাদা আকবরের স্থলে শাহজাদা আজমকে মুঘল বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করায় শাহজাদা আকবর অপমানবোধ করেন। তিনি রাজপুতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলে ঘোষণা দেন। এ সময়ে আওরঙ্গজেব আজমীরে অবস্থান করছিলেন। তিনি কূটকৌশলে শাহজাদা আকবরের সঙ্গে রাজপুতদের বন্ধুত্ব বিনষ্ট করতে তৎপর হন। আওরঙ্গজেব এমন একটি মিথ্যা পত্র পাঠালেন যা থেকে মনে হয় যে, শাহজাদা আকবর সম্রাটের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই নীতি গ্রহণ করেছেন।চিঠিখানা যাতে রাজপুতদের হস্তগত হয় আওরঙ্গজেব সেই ব্যবস্থাও করলেন। রাজপুতরা আওরঙ্গজেবের কূটকৌশল বুঝতে না পেরে শাহজাদা আকবরকে পরিত্যাগ করেন। রাজপুতেরা কিছুদিনের মধ্যে আওরঙ্গজেবের এই কূটকৌশল বুঝতে পারে। কিন্তু তখন আর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না। আওরঙ্গজেব এইভাবে তাঁর কার্যে সিদ্ধি লাভ করলেন। শাহজাদা আকবরের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস পিতার ক্রোধ থেকে শাহজাদা আকবরকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের নিকট পৌঁছে দেন। মারাঠা নেতা শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সঙ্গে শাহজাদা আকবরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে মেবার ও মাড়োয়ারের যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা মুয়াজ্জমের মধ্যস্থতায় মেবারের সঙ্গে মুঘলদের সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু মাড়োয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের জীবিতকালে সমাপ্ত হয়নি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর দুই বছর পর ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (মুয়াজ্জম) অজিত সিংহকে মাড়োয়ারের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনে। অকাতরে অর্থ ব্যয় করে এবং অগণিত সৈন্য ক্ষয় করে আওরঙ্গজেব দুই ক্ষুদ্র রাজপুত রাজাকে পরাজিত করতে পারেননি। এই নীতি একদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্মান হানিকর ছিল, অন্যদিকে সাম্রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে রাজপুত বীরত্ব মুঘলদের সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিল, চরম সংকটের সময়ে আওরঙ্গজেব সেই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের বিরুদ্ধে রাজপুত বীরত্ব মুঘল সম্রাটদের পক্ষে একান্ত সহায়ক হতো। শাসনের দিক দিয়েও মুঘল সাম্রাজ্য দক্ষ কর্মচারী থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ উপ্ত হয়।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের দাক্ষিণাত্যে রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির অনুসরণ বলা যেতে পারে। সম্রাট আকবরের আমল থেকেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চলে আসছিল। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে দুইভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় ঃ (১) পিতা শাহজাহানের

রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারূপে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি,(২) সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি।

শাহজাহানের শাসনকালে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হিসেবে আওরঙ্গজেব দুইবার নিযুক্ত হন এবং সেখানে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন। প্রথমবার তিনি ১৬৩৬ খ্রি. থেকে ১৬৪৩ খ্রি. পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে সংগঠিত করে আওরঙ্গজেব গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই দুই শিয়া সুলতানি রাজ্যের স্বাধীনতা লুপ্ত করা। গোলকুন্ডার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এককালের মণিমুক্তা ব্যবসায়ী, প্রচুর অর্থের অধিকারী মীর জুমলা। তিনি স্বাধীন শাসনকর্তার ন্যায় আচার-আচরণ করতে থাকলে গোলকুন্ডার সুলতান কুতুব শাহ উদ্ধত প্রধানমন্ত্রীকে নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করেন। মীর জুমলা নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এই সময় দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ আরম্ভ করেন। গোলকুন্ডাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করাই ছিল আওরঙ্গজেবের একমাত্র লক্ষ্য। এই বিষয়ে তিনি মীর জুমলার সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু দারাশিকোহ এবং জাহানারার হস্তক্ষেপে তিনি গোলকুন্ডা জয় করতে পারেননি। সুলতান প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদের বিবাহ দেন। কুতুব শাহের মৃত্যুর পর গোলকুন্ডার শাসক হিসেবে মুহাম্মদ অধিষ্ঠিত হবেন এই প্রতিশ্রুতিও আওরঙ্গজেব কুতুব শাহ থেকে আদায় করেন।

এরপর আওরঙ্গজেব বিজাপুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আদিল শাহের মৃত্যুর পর বিজাপুরে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা আওরঙ্গজেবকে ঈপ্সিত সুযোগ দান করে। সম্রাট শাহজাহানের অনুমতি নিয়ে ১৬৫৭ খ্রিঃ বিজাপুর আক্রমণ করেন। মীর জুমলা এই যুদ্ধে তাঁকে সহযোগিতা দান করেন। একে একে বিদর, কল্যাণী অধিকার করে তিনি যখন রাজধানী বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন ঠিক তখনই জাহানারা ও দারার প্ররোচনায় শাহজাহান হস্তক্ষেপ করেন। বিজাপুরের সুলতান সন্ধি করে প্রচুর ক্ষতিপূরণ এবং বিদর, কল্যাণী এবং পরীন্দা মুঘলদের দিয়ে দেন। অতপর শাহজাহানের মৃত্যু এবং তাঁর পুত্রদের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের জন্য দাক্ষিণাত্যে মুঘল বিজয় সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

আওরঙ্গজেব সিংহাসন লাভের পর তাঁর নীতি কার্যে পরিণত করার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করেন। তাঁর শাসনকালের প্রথম যুগে মূলত উত্তর ভারতই তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র ছিল। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে মারাঠা বীর শিবাজীর অভ্যুদয় হয়। আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা তখন হতেই শিবাজী ধীরে ধীরে ক্ষমতা বিস্তার করছিলেন।সিংহাসন লাভের পর আওরঙ্গজেব নিজ মাতুল শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শায়েস্তা খান প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও মারাঠা জাতীয় অভ্যুত্থানের নেতা শিবাজীকে প্রতিহত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যর্থ শায়েস্তা খান বাংলায় প্রেরিত হন। এরপর আওরঙ্গজেব তাঁর দুই খ্যাতনামা সেনাপতি দিলির খাঁ ও জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁরা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করলেও শিবাজীর ক্ষমতাকে দমন করতে পারেননি। শিবাজী অপ্রতিহতভাবে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। উত্তর ভারতে নানা সমস্যায় ব্যস্ত সম্রাট দাক্ষিণাত্যে দৃষ্টি দিতে পারেননি। এর পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন মারাঠা নেতা শিবাজী। শিবাজী নিজ দক্ষতার স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের সূত্রপাত করেন। অবশেষে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর বিদ্রোহী শাহজাদা আকবর যখন শিবাজীর পুত্র শম্ভূজীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন তখন আওরঙ্গজেব আর স্থির থাকতে পারলেন না। সেই সময়ে তিনি মেবারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে রাজপুত যুদ্ধের অবসান ঘটান এবং ১৬৮১ খ্রি. স্বয়ং দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের মূল কার্যক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ ভারত। তিনি এবার দাক্ষিণাত্যের সুলতান শাসিত দু'টি রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। গোঁড়া সুন্নী আওরঙ্গজেবের পক্ষে শিয়া গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া সহজ ছিল না। অনস্বীকার্যভাবে এই দুই রাষ্ট্র তখন ক্ষয়িষ্ণু এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বিজাপুর ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। মারাঠা অভ্যুত্থান তার ক্ষমতাকে বহুল পরিমাণে সংকুচিত করেছিল। ১৬৮৪ খ্রি. আওরঙ্গজেব বিজাপুর অবরোধ করলে সুলতান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি ১৬৮৭ খ্রি. গোলকুন্ডা রাজ্য আক্রমণ করেন। গোলকুন্ডার জনৈক রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় আওরঙ্গজেব গোলকুন্ডাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন।

বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অধিকার করে আওরঙ্গজেব মারাঠা শক্তিকে বিনষ্ট করতে অগ্রসর হন। আওরঙ্গজেবের আক্রমণ অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে। ১৬৮৯ খ্রি. শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে পরাজিত ও নিহত করে আওরঙ্গজেব মারাঠা রাজধানী রায়গড় অধিকার করেন। শম্ভুজীর নাবালক পুত্র শাহু বন্দি হন এবং তাকে মুঘল অন্তপুরে রাখা হয়। উল্লসিত আওরঙ্গজেব মুঘল ক্ষমতা সুদূর দক্ষিণে বিস্তৃত করেন। ১৬৯০ খ্রিঃ তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর হিন্দু রাজাগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এভাবে সম্রাটের ক্ষমতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু মুঘল সামরিক শক্তি মারাঠা জাতির উত্থানকে দমন করতে পারেনি। ১৬৯১ খ্রি. পর মারাঠারা শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারাম এবং তাঁর পত্নী তারাবাই-এর নেতৃত্বে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে মুঘলদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী তারাবাই নাবালক পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর নামে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এভাবে মারাঠাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। মারাঠাদের এই জাতীয় প্রতিরোধ দমন করা আওরঙ্গজেবের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার কারণ

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার মূল কারণ হলো মুঘল ও মারাঠা বাহিনীর সংগঠন ও রণকৌশলের চরিত্রগত পার্থক্য। মারাঠাগণ ত্বরিৎ আক্রমণ ও গেরিলা যুদ্ধে সুশিক্ষিত ছিল। তার ওপর তারা ছিল কষ্ট সহিষ্ণু ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সেই তুলনায় মুঘল বাহিনীর বিশালত্ব, ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং দরবারী জীবনে অভ্যস্ত বিলাস ও আরামপ্রিয়তা তাদেরকে অকর্মণ্য করে তুলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেও মুঘল সেনাপতিগণ রাজধানীর বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। স্বভাবতই তাঁদের গতি ছিল শ্লথ ও মন্থর। দ্বিতীয়ত, আওরঙ্গজেবের হিন্দুনীতি রাজপুতগণকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছিল। তাই আওরঙ্গজেবের রাজপুত সেনাপতিগণ হিন্দু মারাঠাদের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধ করেননি। তৃতীয়ত, মুঘল সেনাপতিগণের বিলম্বিত নীতি, আক্রমণে তৎপরতার অভাব ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা বহুলাংশে মুঘল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

দাক্ষিণাত্যে নীতির সমালোচনা

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বিশেষত বিজাপুর ও গোলকুন্ডার প্রতি তাঁর ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা একমত নন। এলফিনস্টোন এবং ভিনসেন্ট স্মিথ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে তাঁর চরম রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, আওরঙ্গজেব এই দুই সুলতানি রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করে এবং তাদের শক্তিকে বিনষ্ট করে দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের অভ্যুত্থানকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা মনে করেন, এই দুই রাজ্যের স্বাধীনতা যদি অব্যাহত থাকতো তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই মারাঠা শক্তিকে বাধা দান করতো এবং মারাঠাদের অভ্যুত্থান সহজ হতো না। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার, ড. কালীকিঙ্কর দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই মতবাদকে স্বীকার করেননি।

তাঁদের মতে, মারাঠা শক্তি প্রতিরোধে মুঘল শক্তি এবং এই দুই সুলতানদের মধ্যে মৈত্রী সম্ভব ছিল না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী মুঘল সম্রাটদের সাম্রাজ্য লিপ্সার সঙ্গে এই দুই সুলতান বহুদিন ধরেই পরিচিত ছিলেন এবং সে অবস্থায় নিছক মারাঠা শক্তিকে দমন করার জন্য এই শত্রুতা দূর হতে পারে না। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, আকবরের বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করার পর হতেই দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁদের রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাই মুঘল সম্রাটগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, বিজাপুর, গোলকুন্ডা রাজ্যের শক্তি তখন ক্ষয়িষ্ণু ছিল। তাঁদের সামরিক দক্ষতা এবং ক্ষমতা এরূপ ছিল না যে, একটি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ নতুন শক্তিকে তাঁরা পরাজিত করতে পারেন। তৃতীয়ত, এই দুই সুলতানির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ একটি চিরন্ড়ন সমস্যা ছিল। সুতরাং তারা যে এই বিবাদ-বিসম্বাদের উর্ধ্বে ওঠে ঐক্যবদ্ধভাবে মারাঠাদের বাধা দেবে এই সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। এই অবস্থায় আওরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতিকে পরিপূর্ণভাবে অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্যও একমাত্র আওরঙ্গজেবকেই অযথা দায়ী করার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি নেই।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি

আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। তাঁর ধর্মীয় নীতির লক্ষ্য ছিল, শরীয়ত অনুযায়ী ভারতে ইসলাম ধর্মকে এমন শক্তিশালী করা যার ফলে ভারত প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপিত হবে এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজকর্ম ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হবে। এই গোঁড়া ধর্মীয় নীতি তাঁর রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় আওরঙ্গজেব নিজেকে গোঁড়া সুন্নীদের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে তাঁর দাবি জানান। এবং একই সঙ্গে তিনি তাঁর উদার মতাবলম্বী অগ্রজ দারাকে অধার্মিক ও ইসলামবিরোধী বলে ঘোষণা করেন। এরফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা তাঁকে সমর্থন জানায়। অতএব, আওরঙ্গজেবের শাসন নীতি তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী বা পার্থিব লাভ-লোকসানের দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান হিসেবে তিনি ইসলামী রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এই রাজতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, শাসক পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত নীতি অনুসারে রাজ্য শাসন করবেন। তাঁর রাজ্য শাসনের মূলনীতিই হবে পবিত্র কোরআনের নীতিগুলোকে শাসনের মাধ্যমে কার্যকর করা। এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তিনি ইসলামের অনুশাসনগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন। ফলে তাঁর শাসনকালে মুঘল রাষ্ট্রের বহুল অংশ ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর ফলে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান প্রজারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

সুন্নী মুসলমান প্রজাগণ আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলে মনে করতেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে ইসলাম শাস্ত্র বিরোধী আচার-আচরণ নিষিদ্ধ করেন। তিনি মুদ্রায় 'কলেমা' উৎকীর্ণ করা বন্ধ করেন। কারণ তিনি মনে করতেন, অমুসলমানদের হাতে গেলে তা অপবিত্র হবে। তিনি 'নওরোজ' উৎসব বন্ধ করে দেন। যদিও তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটগণ এই উৎসব পালন করতেন। আওরঙ্গজেব এই উৎসবকে ইসলামবিরোধী বলে মনে করতেন। এছাড়া মুহতাসিব নামে একদল রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। যাদের কাজ ছিল কোরআন নির্দেশিত পথে জনসাধারণ আচরণ করছে কিনা তা দেখা। কোরআনে অননুমোদিত আচার-অনুষ্ঠান কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সম্রাট তাঁর অনুশাসন কার্যকর করতে গিয়ে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিয়াদের 'মহরম' উৎসব পালন নিষিদ্ধ করেন।

১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব দরবারে নৃত্যগীত নিষিদ্ধ করেন। রাজত্বের একাদশ ও দ্বাদশ বছরে যথাক্রমে সোনা, রূপা ও মণিমুক্তা দিয়ে বছরে দু'বার সম্রাটের দেহ ওজনের যে প্রথা এবং প্রত্যহ সকালে জনসাধারণকে দর্শন (ঝরোকা) দেওয়ার যে রীতি ছিল তা তিনি বন্ধ করে দেন। আওরঙ্গজেব তাঁর জন্মদিন

ও অভিষেক দিনে উৎসব পালন বন্ধ করেন। তাঁর মতে, এসব রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ছিল ইসলাম বিরোধী।

১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এক নির্দেশনামায় হিন্দু প্রজাদের ওপরে পুনরায় জিজিয়া কর স্থাপন করেন। তবে বালক, নারী, দাস, ভিখারী এবং নিঃস্বদের এই কর দিতে হতো না। হিন্দু প্রজারা এই কর পুনস্থাপনের জন্য প্রতিবাদ জানালে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হয়নি। তবে একথা সত্যি যে, তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হয়ে জিজিয়া কর প্রবর্তন করেননি। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছিল। রাজকোষকে উন্নত করার জন্য তাঁর রাজত্বের অনেক বছর পরে তিনি জিজিয়া কর পুনপ্রবর্তন করেন।

সর্বশেষে বলা যায়, একজন গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে আওরঙ্গজেব তাঁর স্বীয় ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের মুঘল ইতিহাসে আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তাঁর দোষগুণের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার অনেক ক্ষেত্রে করা হয়নি। তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহানকে নজরবন্দি করে রাখা এবং উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের রক্তপাতের জন্য অধিকাংশ ঐতিহাসিক যুগধর্মকে ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে বিচার না করে আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। অথচ শাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক, সমর নায়ক ও সূক্ষ্ম কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। বিপদে তিনি কখনও সাহস ও ধৈর্য হারাননি। দাক্ষিণাত্যের শাসক হিসেবে তিনি দাক্ষিণাত্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। শাসনকার্যের খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। আইন অমান্যকারীকে কঠোর হস্তে দমন করতেন। শাসন ব্যাপারে তিনি নিজের সর্বাত্মক প্রাধান্যের পক্ষপাতি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ও তাঁর নিয়মতান্ত্রিকতা প্রশংসার দাবি রাখে। কাফী খান বলেন, সাহস কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ইসলামী শাস্ত্রে তিনি প্রভুত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফারসি সাহিত্য, আরবিয় আইন-কানুন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম আমলের সর্ববৃহৎ আইন সংকলন 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী', কাফী খানের 'মুনতাখাব-আল-জেবুর', 'আলমগীরনামা', মা'আসীর-ই-আলমগীরী, 'খুলাসাত-আত-তাওয়ারীখ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং অনাড়ম্বর। পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করে এবং নিজহস্তে টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মিতাহার, স্বল্পনিদ্রা, মাদক দ্রব্যাদিতে অনাসক্তি প্রভৃতি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সারসংক্ষেপ

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিলেন অন্যতম দক্ষ শাসক ও সমর নায়ক। তাঁর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে। তবে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটলেও সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের উত্থান ঘটে। বিশাল সাম্রাজ্যের জটিল শাসনব্যবস্থার প্রতিটি সামান্য বিষয়েও ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাঁর মতো এত সাধাসিধে সম্রাট দিল্লির সিংহাসনে বসেননি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, Allahabad, 1970.*
২. এ, কে, এম, আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।
৩. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন সম্রাটের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে?
(ক) আকবরের আমলে (খ) জাহাঙ্গীরের আমলে
(গ) শাহজাহানের আমলে (ঘ) আওরঙ্গজেবের আমলে।

২। অহোমের রাজধানী কোথায় ছিল?
(ক) বিহার (খ) গড়ঁগা
(গ) উড়িষ্যা (ঘ) পালামৌ।

৩। মীর জুমলার মৃত্যুর পর বাংলার মুঘল শাসনকর্তা কে ছিলেন?
(ক) শায়েস্তা খাঁ (খ) মানসিংহ
(গ) ইসলাম খাঁ (ঘ) ঈসা খাঁ।

৪। আওরঙ্গজেবের পুত্র আকবর কত খ্রি. বিদ্রোহ ঘোষণা করেন?
(ক) ১৭০৭ (খ) ১৬৮১
(গ) ১৬৭৫ (ঘ) ১৬৮২।

৫। বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সুলতানগণ কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন?
(ক) শিয়া (খ) সুন্নি
(গ) খারেজী (ঘ) জবরিয়া।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাংলার শাসনকর্তা মীর জুমলা অহোম ও কুচবিহার অভিযান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। আওরঙ্গজেবের রাতপুত নীতির ফলাফল বর্ণনা করুন।
৩। দাক্ষিণাত্যেআওরঙ্গজেব কেন ব্যর্থহন?
৪। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কেঐতিহাসিকদের মতামত ব্যক্ত করুন।
৫। আওরঙ্গজেবের ধর্মীয়নীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২। আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি পর্যালোচনা করুন।
৩। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির বিবরণ দিন।
৪। আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিশেষ উল্লেখপূর্বক তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৭

মুঘল প্রশাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মুঘল আমলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারবেন;*
- *মুঘল যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারবেন;*
- *মুঘল যুগে স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকলার পৃষ্ঠপোষকতায় সম্রাটদের অবদান বিবৃত করতে পারবেন;*
- *শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুঘলদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।*

মুঘল শাসন ব্যবস্থা

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় 'সম্রাট' ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি একদিকে ছিলেন ধর্মীয় প্রধান, অন্যদিকে রাষ্ট্র প্রধান। এসঙ্গে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি এবং প্রধান সেনাপতি। বাবুর সর্বপ্রথম ভারতে 'সুলতান' উপাধির পরিবর্তে 'পাদশাহ' (বাদশাহ) উপাধি নিয়েছিলেন। মুঘল শাসকদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন যে, 'পাদশাহ' হলো সাম্রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। মুঘল আমলে কোন সম্রাটই 'খলিফা'কে প্রভু বলে মেনে নেননি। সুলতানি আমলে একমাত্র আলাউদ্দিন খলজী ব্যতীত অন্য সকল সুলতান খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। মুঘল শাসন 'ভারতীয় শাসন' না হলেও আকবরের শাসনামলে ভারতীয় জাতীয় শাসনের যে ভিত্তির সূত্রপাত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সকল আধুনিক ঐতিহাসিক একমত। একথাও সত্য যে, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুঘল প্রশাসনেই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে বহিরাগত প্রশাসন ব্যবস্থার সমন্বয়ে অধিক জনকল্যাণকামী ও সহিষ্ণু প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় সম্রাটই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস। যদিও তাঁর মন্ত্রীপরিষদ ছিল, তথাপি তিনি তাঁদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না। তবে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ছিল। সেসব বিভাগের প্রশাসকগণ শাসন পরিচালনায় সম্রাটকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করতেন।

উজির বা ভকিল ঃ সম্রাটের পরেই উজিরের স্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। রাজস্ব এবং অর্থ বিভাগের যাবতীয় কার্যকলাপের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। যেহেতু তাঁর ওপর রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত ছিল সেহেতু তিনিই শাসন বিভাগগুলোর ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। সকল আদেশ-নির্দেশ তিনি সম্রাটের নামে জারি করতেন। প্রকৃতপক্ষে উজিরের দক্ষতার ওপর মুঘল প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভরশীল ছিল। উল্লেখ্য, আকবরের সময় উজিরকে দেওয়ান নামে অভিহিত করা হতো।

মীর বক্সী ঃ কেন্দ্রের সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে মীর বক্সী বলা হতো। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল সৈন্যবাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা, তাদের দেখাশোনা করা, সকলের যাতে বেতনের বন্দোবস্ত করা, যুদ্ধের সময় সৈন্য সম্বন্ধে পুঙ্খখানুপুঙ্খখভাবে সম্রাটকে সংবাদ প্রদান করা ও সৈন্য এবং মনসবদার প্রভৃতি কর্মচারীদের তালিকা প্রস্তুত করা। এসঙ্গে সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণ করা মীর বক্সীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকার নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণ করতেন। এতে দেখা যায় মীর বক্সী প্রধানত একজন সামরিক কর্মকর্তা হলেও বেসামরিক প্রশাসনের অনেক দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হতো।

খান-ই-সামান ঃ মুঘল আমলে সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন খান-ই-সামান। তিনি ছিলেন সম্রাটের সংসারের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সামরিক বিভাগের সকল উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত রাজকর্মচারী। তাঁর অধীনেই ছিল রাজকীয় কারখানাসমূহ। তিনি সম্রাটের ভ্রমণে ও অভিযানে সঙ্গী হতেন এবং সম্রাটের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করতেন। যেহেতু তিনি তাঁর কাজের প্রয়োজনে সব সময় সম্রাটের কাছাকাছি থাকতেন সেহেতু তিনি ছিলেন দরবারে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ।

সদর-উস-সুদুর ঃ সদর-উস-সুদুর ছিলেন ধর্ম ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ত্রাণ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি সাহিত্যিক, কবি, পন্ডিত ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, আলেম, উলেমা, সুফি-দরবেশ, দুঃস্থ, দরিদ্র, বিধবা, এতিম, নাবালক, কাজী, শিক্ষক প্রমুখকে দান ও উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। ধর্মীয় শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দান করা হতো।

কাজী-উল-কুজ্জাত ঃ সম্রাটের অধীনে সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগীয় প্রধানকে বলা হতো কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতি। তিনি হতেন একজন আইনজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্র এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি সাম্রাজ্যের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার পরিচালনা করতেন। তাঁকে বিচার কার্যে সহযোগিতা করতেন মুফ্তি ও মীর-ই-আদল নামে দু'জন কর্মকর্তা। কাজী মামলার নিরপেক্ষ তদন্ত করতেন, মুফ্তি আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন আর মীর-ই-আদিল রায় প্রদান করতেন।

মুহ্তাসিব ঃ মুঘল প্রশাসনে মুহ্তাসিব ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল অ-ইসলামীয় বিধানগুলো নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকা। এককথায় তিনি ছিলেন জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের তত্ত্বাবধায়ক। মদ্যপান, জুয়াখেলা ও পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অসামাজিক কর্মকান্ড বন্ধ করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত ছিল এবং প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে ত্বরিত বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাছাড়া বাজারে জিনিসপত্রের বাজারদর তদারক, খাদ্যে ভেজাল বা ওজনে কম ইত্যাদি ধরনের অপরাধ তদন্তের দায়িত্বও তিনি পালন করতেন।

অন্যান্য রাজকর্মচারী ঃ উল্লেখিত রাজকর্মচারী ছাড়া আরও বহু কর্মঠ ও সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁদের নিরলস চেষ্টায় মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এদের মধ্যে গুপ্তচর বিভাগের 'দারোগা-ই-ডাকচৌকী', তোপখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'দারোগা-ই-তোপখানা', প্রজা-সাধারণের আবেদন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'মীর আরজ', হিসাব পরীক্ষক 'মুস্তাফী', সরকারি বাড়িঘরের তদারককারী 'মীর-মঞ্জিল', কেরানি ও সংবাদ লেখক 'ওয়াক-ই-নবিশ' এবং রাজসভার অনুষ্ঠানের রীতিনীতির তত্ত্বাবধায়ক 'মীর-তোজাক' উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক প্রশাসন

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, মুঘল আমলের প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অবিকল একটি ক্ষুদ্র চিত্র। মুঘল আমলে সকল সম্রাটের শাসনকালে সুবা বা প্রদেশের সংখ্যা এক ছিল না। যেমন আকবরের রাজত্বকালে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ১৫, জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৭, শাহাজাহানের সময়ে ২২ (১৬৪৮ খ্রিঃ কান্দাহার হস্তচ্যুত হলে ২১) এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ২১টি। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য 'সুবা'গুলোকে 'সরকার' এবং 'সরকার'গুলোকে 'পরগণা'য় বিভক্ত করা হয়েছিল। কতগুলো গ্রামের সমন্বয়ে একটি পরগণা গঠন করা হতো।

সুবাদার ছিলেন প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্রাটের অনুমতি নিতে বাধ্য ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং প্রদেশে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। সুবাদার পদটি প্রশাসনে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় সাধারণত সম্রাটের পুত্র এবং তাঁর বিশ্বস্ত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। তাঁকে প্রশাসনে সহযোগিতা করতেন দেওয়ান, বকসী, সদর, কাজী, ফৌজদার, কোতোয়াল, আমিল, বিতিকচি, পোদ্দার, ওয়াক-ই-নবিশ ও পাটোয়ারী নামক রাজকর্মচারীবৃন্দ।

মুঘল যুগে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা

মুঘল যুগে ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু মুঘল যুগের রাজদরবারের ঐতিহাসিকগণ অথবা সমকালীন ঐতিহাসিকগণ সমসাময়িককালের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি। এঁরা প্রধানত সম্রাটদের গৌরবগাথা, রাজসভার জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যুদ্ধ ও বিজয় অভিযানের কাহিনী লিখে গেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। মুঘল সম্রাটদের শাসনামলে বহু বিদেশী পর্যটক, ভ্রমণকারী এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা সমসাময়িক ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যবান তথ্যের সন্ধান মেলে। এসব বিদেশী পর্যটকদের বিবরণই এই বিষয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। এসব পর্যটকদের মধ্যে স্যার টমাস রো, উইলিয়াম হকিন্স, রাল্‌ফ ফীচ, ফান্সিসকো পেলসার্ট, বার্নিয়ে, ট্যাভার্নিয়ে, মানুচির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুঘল সমাজ জীবন

মুঘল যুগের সমাজ ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সম্রাটের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাঁর নিচেই অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান ছিল। বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী এই সম্প্রদায় অর্থ ও সম্পদে বিত্তবান ছিলেন।তাঁরা ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। রাজসভায় যে প্রাচুর্য ও অমিতব্যয়িতা বর্তমান ছিল, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তার বিস্তৃতি ঘটেছিল। মদ্যপান, ব্যভিচার ছিল অভিজাত শ্রেণীর জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। মুঘল রাজদরবার তথা সম্রাট নিজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন না। 'হারেম' ব্যবস্থা সমসাময়িক যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন– সম্রাটের হারেমে পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক থাকতো। অভিজাত শ্রেণী নিজ সামর্থ মতো সম্রাটকে এ দিক দিয়ে অনুসরণ করতেন। জাহাঙ্গীরের সময় পেলসার্ট নামক জনৈক ওলন্দাজ বণিকের বিবরণ থেকে অভিজাতদের চরম চারিত্রিক ও নৈতিক নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা প্রভৃতি কাজ করেছিল। মুঘল রাজদরবার

জাঁকজমক ও বৈভবের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এরূপ দরবারে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য অভিজাতবর্গও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রত্নালঙ্কারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন।

অভিজাত সম্প্রদায়ের পরেই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান। দোকানদার, ব্যবসায়ী, বণিক, মহাজন প্রভৃতি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণী সাধারণত মিতব্যয়ী ছিল। নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী তারা জীবনযাপন করতো। এবং ব্যভিচার, মাদকাসক্তি প্রভৃতি থেকে মুক্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম উপকূলের বণিকগণ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা স্বচ্ছল ছিলেন এবং এরা কিছুটা উন্নত ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতো।

সাধারণ মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বা সাচ্ছল্য ছিল না। প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো রাজদরবারে প্রাচুর্যের সঙ্গে ছিল জনসাধারণের অসীম দারিদ্রতা। সাধারণ মানুষের জীবনে বাহুল্যের কোন স্থান ছিল না। সাধারণ সময়ে ভরণপোষণের অভাব না হলেও দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের সময় তাদের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছতো। ওলন্দাজ পর্যটক পেলসার্টের বিবরণ থেকে সাধারণ মানুষের অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উলে- খ করেন যে, সমাজে এই শ্রেণীর লোক নামে স্বাধীন প্রজা হলেও কার্যত তারা ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতো। এরা হলো শ্রমজীবী, ভৃত্য এবং ছোট দোকানদার। তাদের আয় ছিল সামান্য এবং তাদের কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। যে গৃহে তারা বসবাস করতো এবং যে খাদ্যদ্রব্য তারা গ্রহণ করতো তাতে সাচ্ছল্যের কোন লক্ষণ ছিল না। তাছাড়া রাজ কর্মচারীদের উৎপীড়ন তাদের ওপর বেশি ছিল। শাহজাহানের আমল থেকে কৃষকদের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। ফলে তাদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে ওঠে।

মুঘল আমলে মূলত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যভিচার, অমিতাচার দেখা যেত। সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এসব দূরাচার ছিল না বললেই চলে। এরা যেমনি ছিল মিতাচারী তেমনি ধর্মপরায়ণ। বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা, কৌলিণ্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা ঐ যুগের সামাজিক ব্যাধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁরা স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। ট্যাভার্নিয়ে তাঁর বর্ণনায় হিন্দুদের নৈতিকতা সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, তৎকালীন হিন্দু সমাজ মিতব্যয়ী, সৎ এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন

মুঘল যুগে ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষি প্রধান ছিল। কৃষকরা সামান্য জমিতে চাষ করতো এবং তারাই রাজস্বের প্রধান ভার বহন করতো। গম, বার্লি, ধান, বজরা, বিভিন্ন ধরনের ডাল, তুলা ইত্যাদি ছিল প্রধান কৃষিজাত পণ্য। বাংলা ও বিহারে ইক্ষুর চাষ হতো। বাংলায় পাটের চাষও ভালোরকম হতো। পেলসার্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মধ্য ভারত ও যমুনা উপত্যকায় প্রচুর নীলচাষ হতো। এছাড়া কার্পাস ও রেশম এই সময় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বার্নিয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই দুই দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য বাংলা এ সময় ভারতের ভান্ডার ছিল। আকবরের রাজত্বকালে জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুঘল যুগে শিল্পের প্রসার ঘটে। শিল্পোৎপাদন মুঘল যুগের অর্থনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। মুঘল যুগে শ্রম বিভাজন ও দক্ষতাভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল ধরে একই শ্রেণীর মানুষ একই শিল্পকার্যে রত থাকায় দক্ষ কারিগর ও শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন শিল্প অথবা বণিক সংঘ ছিল। এই সময় রাজকীয় ও বেসরকারি শিল্পোদ্যোগেও কারখানা গড়ে ওঠে। বেসরকারি শিল্পে দেশের চাহিদা ও রপ্তানির জন্য

পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হতো। রাজকীয় কারখানাগুলোতে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতদের চাহিদা অনুযায়ী বিলাস সামগ্রী তৈরি হতো।

লোহা ও সোরা শিল্প ছিল এই যুগের প্রধান শ্রম শিল্প। কিন্তু শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল কার্পাস ও বয়ন শিল্পের। এই যুগে উৎপাদিত শিল্প সম্ভার দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হতো। তন্মধ্যে বস্ত্র ছিল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এ সময় ভারতবর্ষের নানাস্থানে যেমন গুজরাট, খান্দেশ, জৌনপুর, বারাণসী, বাংলা ও উড়িষ্যায় বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র ছিল। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় মিহি বস্ত্র অধিক তৈরি হতো। ঢাকার মসলিনের খ্যাতি ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের উৎপন্ন বস্ত্র বিদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হতো। পেলসার্ট ও বার্নিয়ের বিবরণে এই যুগের বস্ত্র শিল্পীদের উৎকর্ষের অকুণ্ঠ প্রশংসার উল্লেখ পাওয়া যায়। রেশম শিল্পও অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল। বাংলা রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এছাড়া শাল, গালিচা, পশম দ্রব্যের উৎপাদনেও ভারতবর্ষ এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।

মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ খুবই উন্নত ছিল। ইউরোপীয় বণিকদের ভারত আগমনের পর থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। ভারতবর্ষ হতে নীল, সোরা, রেশম, কার্পাস বস্ত্র ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। বিদেশ থেকে মণিমুক্তা, ঘোড়া, চীনামাটির বাসন ও ক্রীতদাস আমদানি করা হতো। লাহোর, সুরাট, গোয়া, কালিকট, কোচিন, সাতগাঁ, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও ছিল এই সময়ের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর। আন্তবাণিজ্যেও মুঘল যুগে ভারত উন্নত ছিল। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দেশে বহু রাজপথ এবং পথের ধারে অনেক পান্থশালা নির্মাণ করা হয়েছিল। তাছাড়া নদীপথে দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বাণিজ্য চলতো।

মুঘল যুগে ভারতবর্ষে বহু বড় বড় শহর ছিল। রাল্‌ফ ফিচের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আগ্রা ও ফতেপুর জনবহুল শহর ছিল এবং এই দু'টি শহর লন্ডনের চেয়ে কোন অংশেই হীন ছিল না। টেরী পাঞ্জাবকে সমৃদ্ধ প্রদেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লাহোর এই প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর ছিল। মানসারেট লাহোরকে এই সময় ইউরোপ ও এশিয়ার অদ্বিতীয় শহর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শহরগুলোতে জিনিসপত্রের প্রাচুর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। রাল্‌ফ ফিচও শহরগুলোর সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। খান্দেশের বুরহানপুর, গুজরাটের আহমেদাবাদ, পূর্ব ভারতের বারাণসী, রাজমহল, পাটনা, বর্ধমান, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এই সময়ে খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

নাগরিক সভ্যতার জাঁকজমক ও বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি সত্ত্বেও কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী ছিল দারিদ্র্যে জর্জরিত। অনাবৃষ্টির ফলে প্রায়ই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু খাজনা মওকুফ ও অন্যান্য সাহায্যমূলক অনুদান দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের কষ্ট লাঘবের কোন ব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই চলে।

মুঘল সংস্কৃতি

শিল্প ও সাহিত্য

মুঘল যুগে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলস্বরূপ যে নবচেতনার সৃষ্টি হয়েছিল সমকালে তা স্থাপত্য কলা ও সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটে। হিন্দু-মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে সেকালে এক বলিষ্ঠ শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল। মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক। মুঘল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে যে সকল দুর্গ, প্রাসাদ বা অট্টালিকা মুঘল সম্রাটগণ নির্মাণ করেছিলেন তাতে তাঁদের শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘল যুগের প্রথম দিকে স্থাপত্যে বৈদেশিক তথা পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও আকবরের পরবর্তী সম্রাটদের আমলে মুঘল স্থাপত্য ভারতীয় হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "আকবরের উত্তরাধিকারীগণের আমলে ভারতীয় স্থাপত্য ও

চিত্রশিল্প বৈশিষ্ট্যগতভাবে সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে বিন্দুমাত্র পারস্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বহু প্রভাবে সৃষ্ট মুঘল রীতি তার পূর্বে প্রচলিত শিল্পরীতি অপেক্ষা অনেক শৌখিন এবং অলঙ্কৃত ছিল। প্রাক-মুঘল যুগের বিকাশ ও সরল রীতির তুলনায় সূক্ষ্মতায় ও অলঙ্করণে তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।"

দুর্ধর্ষ বীর তৈমুরের মধ্যে যে শিল্পীসত্তা বর্তমান ছিল বাবুর তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় তিনি শিল্প সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি সৌধ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তিনি অসংখ্য শিল্পী ও কারিগর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত স্বল্প হওয়ায় এবং তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে ভারতবর্ষে এমন কোন শিল্প-সৌধ নির্মিত হয়নি, যার দ্বারা বাবুরের শিল্পানুরাগের প্রকৃত মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তাঁর নির্মিত সৌধের মধ্যে পানিপথের কাবুলিবাগ মসজিদ এবং সম্বলের জামি মসজিদ এখনও বিদ্যমান। বাবুরপুত্র হুমায়ুন অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে তাঁর পক্ষে স্থাপত্য শিল্পের প্রতি মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃত সূচনা ঘটে আকবরের শাসনামলে। আকবর ছিলেন শিল্প রসিক। দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি সৌধ, ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ ও সিকান্দ্রায় নিজের সমাধি সৌধ তাঁর বলিষ্ঠ শিল্পরুচির পরিচায়ক। পারসিক ও ভারতীয় রীতির সমন্বয়ে মুঘল স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হয়। হুমায়ুনের সমাধি সৌধ নির্মাণে প্রথম মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়। শিল্প সমালোচক পার্সি ব্রাউনের মতে, সৌধটি পারসিক পরিকল্পনায় ভারতীয় ব্যাখ্যা অথবা পারসিক সৌধ নির্মাণ রীতির ভারতীয়করণ। ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদও মুঘল স্থাপত্যরীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই প্রাসাদ নির্মাণে আকবর প্রথম লাল রং-এর বেলে পাথর ব্যবহার করেন। ফতেপুর সিক্রীর বুলন্দ দরওয়াজা বিরাটত্বে ও সৌন্দর্যে অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। তিনি প্রধানত চিত্রকলায় অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তিনি অবশ্য সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি সৌধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত ইতিমাদ উদ্দৌলা'র সমাধি সৌধটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নতুনত্বের স্বাক্ষর বহন করে। এই সৌধটি শ্বেত পাথরে নির্মিত এবং সূক্ষ্ম কাজ ও অলংকরণে অপূর্ব।

আকবরের সময় মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প বিকাশের যে সূচনা হয় তাঁর সফল পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে শাহজাহানের সময়ে। শাহজাহান ছিলেন স্থাপত্য ও শিল্পকলার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসনামলে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে। তাঁর শাসনকাল ছিল মুঘল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের যুগ। আকবরের আমলের লাল বেলেপাথরের পরিবর্তে শাহজাহান শ্বেতপাথর ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যান নির্মিত হয়েছিল। দিল্লির লালকেল্লা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অলংকারে ভূষিত বিস্ময়কর রাজপ্রাসাদ। লালকেল্লায় শাহজাহানের দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি সূক্ষ্ম অলংকরণে ভূষিত মুঘল স্থাপত্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। দেওয়ান-ই-খাসে শাহজাহান নিজেই লিখেছেন, "বিশ্বে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এখানেই আছে, আর কোথাও নেই।" লালকেল্লায় মোতি মসজিদটিও খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দিল্লির জামা মসজিদটিও খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হলো তাজমহল। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি এই মর্মরসৌধটি তৈরি করান। তাজমহল নির্মাণে পারস্য, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাজমহল দামি শ্বেতপাথরে নির্মিত, এর কারুকার্য ও অলংকরণের তুলনা নেই। স্থাপত্যের নিদর্শন না হলেও শাহজাহান নির্মিত 'ময়ুর সিংহাসন' মুঘল কারুশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের দৈন্যদশা শুরু হয়। আওরঙ্গজেব স্থাপত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, ফলে মুঘল স্থাপত্য রীতির অবক্ষয় শুরু হয়।

মুঘল চিত্রকলা

মুঘল আমলে স্থাপত্য শিল্পের ন্যায় চিত্রকলায়ও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এক্ষেত্রেও আকবরের সময় থেকেই নতুন এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। বিদেশী ও দেশীয় ভাবধারার সমন্বয়ে যে নতুন চিত্রকলার উদ্ভব হয়েছিল রুচি ও নৈপুণ্যের দিক দিয়ে তা সার্থক সৃষ্টি। আকবর ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলমান শিল্পীদের কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং সমালোচনা করতেন। আবদুল সামাদ, মীর সৈয়দ আলি, কারক বেগ, দাদবন্ত, বসোয়ান, সেনিওয়াল দাস এবং তারাচাঁদ এই যুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী। চিত্রকলার প্রতি জাহাঙ্গীরের অনুরাগ ছিল। স্যার টমাস রো-র বর্ণনা হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সময় হিন্দু শিল্পীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। জাহাঙ্গীরের সময়ে চিত্রকলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মুসলিম চিত্রকলায় পারসিক প্রভাব পরিহার। এই সময় অঙ্কনরীতি চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "An important fact worth mention in Jahangir's reign is the elimination of Persian influence. The art becomes essentially Indian in character and Indian genius triumphs." জাহাঙ্গীরের পর চিত্রকলার উন্নতি, বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় না। আওরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের পিছনে অর্থব্যয়কে অপচয় এবং ইসলাম বিরোধী বলে মনে করতেন। ফলে তাঁর আমলে চিত্রশিল্পের পুরোপুরি অবনতি ঘটে।

মুঘল যুগের চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল দরবার জীবন, রাজকীয় উৎসব, শিকার ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে পার্সি ব্রাউন বলেন, "মুঘল অংকনরীতি ও বিষয়বস্তু ছিল জড়, বিদেশী এবং বিভিন্ন ধারা হতে সংগৃহীত, কিন্তু হিন্দু অঙ্কনরীতি ও বিষয়বস্তু ছিল আধ্যাত্মিক ও প্রতীকী।" প্রকৃতপক্ষে, মুঘল চিত্র শিল্পে জনসাধারণের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। শুধুমাত্র শাসক শ্রেণী ও শাহজাদাগণ ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। রাজদরবারের বাইরে এর অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

মুঘল যুগে দরবারের বাইরে এক ধরনের চিত্রকলার বিকাশ রাজপুতনায় হয়। এটি রাজপুত পদ্ধতি বা Rajput School নামে পরিচিত। অনেকক্ষেত্রে রাজপুত পদ্ধতি মুঘল পদ্ধতির চেয়ে উন্নত এবং চিত্তাকর্ষক ছিল। রাজপুত চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হলো জনসাধারণের সঙ্গে এর যোগ। এটি ছিল মহৎ এবং গণতান্ত্রিক। রাজপুতনার হিন্দু শিল্পীগণ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এবং প্রচলিত প্রথাকে শিল্পের বিষয়বস্তু রূপে ব্যবহার করতেন। নুরপুর, বাশোলি, চম্বা ও জম্মুর চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের উপাখ্যান। তাঁরা রাধা-কৃষ্ণ লীলা, হর-পার্বতীর প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও পৌরাণিক কাহিনীকে চিত্রায়িত করেছিলেন। সূক্ষ্মতা, রঙের চমৎকারিত্ব এবং বর্ণনার খুঁটিনাটি রাজপুত চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য।

সঙ্গীত

শিল্পকলার আর যে বিশেষ দিকে মুঘলরা তাঁদের রসিক মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা হল সঙ্গীত। অন্যান্য কলার ন্যায় মুঘল সম্রাটগণ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সঙ্গীত এবং সঙ্গীতজ্ঞরা রাজকীয় সাহায্য পেতেন। তানসেন, সুরদাস, বৈজু, বাওড়া, বাবা রামদাস প্রমুখ মুঘল যুগের সঙ্গীতকার ও সুরস্রষ্টাগণ ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বাবুর, হুমায়ুন, আকবর,জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, এমন কি রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর আওরঙ্গজেব সঙ্গীতপিপাসু ছিলেন। রাগপ্রধান ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চায় মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে, রাজদরবারের বাইরে সঙ্গীত চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এক নতুন স্তরে উপনীত হয়েছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্য

মুঘল যুগে আধুনিক যুগের ন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও মুঘল সম্রাটগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মক্তব, মাদ্‌রাসা ও টোল স্থাপন পূর্বক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলতো। এ সময়ে বহু হিন্দুও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। উপনিষদ, ভগবদ গীতা, রামায়ণ ঐ যুগে সংস্কৃত হতে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। স্ত্রী শিক্ষা সে সময়ে চালু ছিল। রাজপরিবারের যে সমস্ত মহিলা আরবি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবুরের কন্যা গুলবদন বেগম, নুরজাহান, মমতাজমহল, জাহানারা, জেবউন্নিসা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মুঘল সম্রাটগণের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা কৃতিত্বের দাবি রাখে। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, কবিতা এবং অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল। আকবরের রাজত্বকালে 'তারিখ-ই-আলফি', 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবরনামা', 'মাসির-রহিমী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিলো। রামায়ণ, মহাভারত এবং অথর্ববেদ তাঁর সময়ে ফারসিতে অনূদিত হয়েছিল। ফৌজি, খিজালী, হুসেন নাজিরী, জামালউদ্দিন উরফি তৎকালে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আকবরের শাসনকাল ভিন্ন বাবুরের জীবনস্মৃতি, জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি, ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, মা'সীর-ই-জাহাঙ্গীরী, জবদ-উৎ-তোওয়ারিখ, পাদশাহনামা, শাহজাহাননামা, আলমগীরনামা, মুন্তাখাব-উল-লুবাব প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মুঘল যুগে রচিত হয়েছিল।

সারসংক্ষেপ

মুঘল প্রশাসন ছিল মূলত এককেন্দ্রিক। সম্রাটই ছিলেন প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি উজির, মীর বক্সী, খান-ই-সামান, সদর-উস-সুদুর, কাজী-উল-কুজ্জাত, মুহ্‌তাসিব সহ বিভিন্ন রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় রাজকার্য পরিচালনা করতেন। উল্লেখ্য আকবরই মুঘল প্রশাসনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। মুঘল সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল। সমাজে অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ– এই তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মুঘল যুগের অর্থনীতি মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সচ্ছল ছিল না। এযুগে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-সাহিত্যে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৬।
২. Iswari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India.* Allahabad, 1970.
৩. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।
৪. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাবুর 'সুলতান' উপাধির পরিবর্তে কোন উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন?
(ক) পাদশাহ (খ) বাদশাহ

(গ) রাজশাহ (ঘ) খলিফা।

২। মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন?
(ক) মুহতাসিব (খ) উজির
(গ) কোতোয়াল (ঘ) খান-ই-সামান।

৩। আওরঙ্গজেবের সময়ে কয়টি 'সুবা' ছিল?
(ক) ২২টি (খ) ২১টি
(গ) ১৭টি (ঘ) ১৫টি।

৪। মুঘল যুগে প্রধান শ্রম শিল্প কোনটি?
(ক) লোহা ও সোরা (খ) রেশম ও বস্ত্র
(গ) কার্পাস ও বয়ন (ঘ) শাল ও গালিচা।

৫। 'ময়ূর সিংহাসন' কে নির্মাণ করেছিলেন?
(ক) আকবর (খ) শাহজাহান
(গ) হুমায়ুন (ঘ) আওরঙ্গজেব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উজিরের দায়িত্ব-কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনে মীর বক্সীর ভূমিকা কি ছিল?
৩। কাজী-উল-কুজ্জাত কে ছিলেন? তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা দিন।
৪। মুঘল আমলে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৫। মুঘল আমলে অভিজাত শ্রেণীর সমাজ জীবনের বর্ণনা দিন।
৬। মুঘল আমলের শিক্ষা ও সাহিত্যের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
২। মুঘল যুগে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।
৩। মুঘল যুগে ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের বিকাশের বিবরণ দিন।

পাঠ - ৮

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে বৈদেশিক আক্রমণের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।*

রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে কোন কিছুই একমুখী চলেনা, উত্থান ও পতন সময়ের ব্যবধানে ঘটে। অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই তা হয়ে থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। একদা যে মুঘল সাম্রাজ্যে সমগ্র উত্তর ভারত, মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা কালের গতিতে ধুলিস্যাৎ হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে। ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য যেসব কারণের সমন্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে সেসব শক্তির ভিন্নরূপ প্রকাশই লক্ষণীয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ তথা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করে তুলেছিল।

অভ্যন্ড়রীণ কারণ

১. সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব ঃ মুঘল আমলে যে পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার সফলতা নির্ভর করতো কেন্দ্রীয় শাসক তথা সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও শাসন দক্ষতার ওপর। অদক্ষ আরামপ্রিয় বা কম প্রতিভাসম্পন্ন সম্রাট অধিষ্ঠিত হলে সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই দেখা যায়, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের মতো প্রতিভাবান শাসকের শাসনকালে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অনেক সংকট থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো সুকৌশলে দমন করে তাঁরা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা প্রায় সকলেই পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের মতো শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন না। অকর্মণ্য ও অযোগ্য এ সমস্ত শাসকের দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নৃশংসতা এ যুগের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অপদার্থ সম্রাটগণ নামমাত্র শাসকে পরিণত হন এবং তাঁরা ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীদের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। এসব সম্রাটের অযোগ্যতাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। মূলত আওরঙ্গজেব পরবর্তী সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

২. উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাব ঃ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। ফলে সম্রাটদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ সিংহাসনের দাবি নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন– যা সাম্রাজ্যের পক্ষে চরম সংকট সৃষ্টি করতো। শাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে দরবারে অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠী রাজনীতি শুরু হয়, তার ফলে সাম্রাজ্যের প্রভুত ক্ষতি হয়। পরবর্তী মুঘলদের শাসনকালেও এই গৃহযুদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্যে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। যে কারণে আরওঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্বে পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন করে মুসলিম আইন অনুযায়ী 'ওসিয়তনামা' বা ইচ্ছাপত্র করে যান। কিন্তু পুত্রগণ তা মান্য করেননি। কাজেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের গুরুত্ব বিচারে মুঘল রাজপরিবারের গৃহযুদ্ধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

৩. সাম্রাজ্যের বিশালতা ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতাও এই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। আওরঙ্গজেবের শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের চরম সীমায় আরোহণ করে। এটি উত্তরে আফগানিস্তান, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে কাশ্মির ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের যোগাযোগ ও সংবাদ সংগ্রহ সহজ ছিল না। শক্তিশালী শাসকের আমলে যা প্রকাশ পায়নি দুর্বল শাসকদের সময় তা প্রকাশিত হতে থাকে। সুদূর অঞ্চলের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করা তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ বিশাল সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হন।

৪. অভিজাতদের নৈতিক অবক্ষয় ও স্বার্থের সংঘাত ঃ অভিজাত আমীরদের চারিত্রিক পরিবর্তন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আকবর সৃষ্ট এই অভিজাত আমীরগণই ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের মেরুদন্ড স্বরূপ। মুঘল সাম্রাজ্যের উন্নতির যুগে বিশেষত ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে অভিজাতগণ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও উন্নতিতে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অভিজাতদের চরিত্রে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট পরিবর্তন এসে পড়ে। বিলাসবহুল এবং অপরিসীম বৈভবে জীবন অতিবাহিত করে তাঁরা নির্বিরোধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে তাঁরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উৎসুক হয়ে পড়েন। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁদের নিকট অভিপ্রেত হয়ে দাঁড়ায়। সম্রাট তাঁদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। এসঙ্গে দেশীয় অভিজাত এবং বিদেশী অভিজাতদের মধ্যে প্রতিনিয়তই ক্ষমতা দ্বন্দ্ব লেগে থাকতো। মুঘল রাজদরবারের অভিজাতবর্গ পরস্পর বিরোধী 'ইরানি', 'তুরানি' ও 'হিন্দুস্তানি'-এই তিন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দ্বিধাবিভক্ত এই অভিজাতবর্গের উপদলীয় সংঘর্ষ ও উচ্চাভিলাষমূলক কর্মকান্ড মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৫. মুঘল সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ঃ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মুঘল সামরিক সংগঠনের ত্রুটিকে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক আরভিন ও ভিনসেন্ট স্মিথ সামরিক ব্যবস্থার ত্রুটির ব্যাপারে প্রধানত দায়ী করেছেন 'মনসবদারি' ব্যবস্থাকে। তাঁদের অভিমত হলো, মনসবদাররা অশ্বারোহী সৈন্য রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ জায়গীর থেকে পেতেন, তা নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পিছনে ব্যয় করে ফেলতেন। ফলে অনেক সময় প্রয়োজনে যোগ্য সেনা সরবরাহ করে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হতেন। যোগ্য অশ্বারোহী সেনা না রেখে প্রয়োজনে অশিক্ষিত অশ্বারোহী নামমাত্র সৈন্য পাঠাতেন। তাছাড়া প্রত্যেক মনসবদারের অধীনে সৈন্য থাকায় তাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের স্বার্থে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হতো না। উপরন্তু মনসবদারি ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী তাদের মনসবকে চিনতো। প্রত্যক্ষভাবে তারা সম্রাট বা সেনাপতির অধীনে ছিল না। কাজেই মনসবদারি ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য মুঘল সৈন্যবাহিনী কখনো একটি অষন্ড জাতীয় সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হতে পারেনি। এছাড়া মুঘল অস্ত্রশস্ত্রও আধুনিক ছিল না। তাদের কামানগুলো ছিল সেকেলে। এই কামানগুলো একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত নিয়ে যাওয়া যেতো না। মুঘল সৈন্যবাহিনী দরবার ও হারেম সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতো। এই বিপুল দ্রব্যসম্ভার মুঘল সেনাবাহিনীর ক্ষিপ্রতা বিনষ্ট করতো।

মুঘল সম্রাটরা স্থলবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয় যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষার জন্য যে নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল তা উপলব্ধি করতে পারেননি। যদিও আকবর এই বিবেচনায় নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী মুঘল সম্রাটরা তাতে উদাসীন ছিলেন। মুঘল নৌবাহিনী থাকলে পাশ্চাত্য বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে সহজে সক্ষম হতো না। এজন্যে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে নৌবাহিনীর অভাবকে দায়ী করেছেন।

৬. অর্থনৈতিক সংকট ঃ অর্থনৈতিক সংকট মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সৈন্যবাহিনী পোষণে বিপুল অর্থ ব্যয় হতো। বিশেষত আওরঙ্গজেবের সময়ে বিদ্রোহ দমন, রাজ্যজয় ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অজস্র অর্থ খরচ হয়। দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্য অভিযানে রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং দারুন অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই সংকট নিরসনের জন্য অধিক হারে কর আদায় করা হয়। এতে কৃষকরা অসন্তুষ্ট হয় এবং মাঝে মাঝে কৃষক শ্রেণী বিদ্রোহ করে। সামরিক বাহিনী দ্বারা এসব বিদ্রোহ দমন করা হয়। তথাপি আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করা যায়নি। এমন কি সৈন্যদের বেতন দেয়াও কষ্টকর হয়ে পড়ে। পরবর্তী দুর্বল শাসকদের আমলে রাষ্ট্রের আয় আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। আর্থিক দুরবস্থা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলে।

৭. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ আওরঙ্গজেব অনুসৃত দাক্ষিণাত্য নীতিও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। সুন্নী সম্রাট আওরঙ্গজেব গোলকুন্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের শিয়া সুলতানদের স্বাধীনতা ধ্বংস করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। মারাঠাদের জাতীয় অভ্যুত্থানকে দমন করতে গিয়ে আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের পতনকে অনিবার্য করে তোলেন। জীবন সায়াহ্নে দীর্ঘ সময় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের মারাঠা শক্তি দমনে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় ছাড়া এই সুদীর্ঘ অভিযান সাম্রাজ্যের জন্য কোন স্থায়ী ফল আনতে পারেনি। অপরদিকে এতে সাম্রাজ্যের আর্থিক এবং সামরিক শক্তি নিদারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজধানী থেকে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁর একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থায় নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে এবং সেদিক দিয়ে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। "দাক্ষিণাত্য তাঁর দেহ ও খ্যাতির কবরে পরিণত হয়েছিল।"

৮. কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য ও প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি বিশেষ কারণ। আওরঙ্গজেব যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন দিল্লি থেকে তার শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। সম্রাটদের অকর্মণ্যতা, অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্র, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উচ্চাভিলাষ সাম্রাজ্যকে অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতার

সুযোগে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তাগণ নামেমাত্র সাম্রাজ্যের আনুগত্য স্বীকার করে কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নিযাম-উল-মূলক দাক্ষিণাত্যে, মুর্শিদকুলী খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায়, সাদত খান অযোধ্যায় এবং আলী মুহম্মদ খান রোহিলাখন্ডে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত স্বাধীন নবাব মুঘল সম্রাটকে বাৎসরিক কর প্রদান করে মুঘল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও এতে সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি নষ্ট হয়।

৯. মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ঃ মারাঠা শক্তির উত্থান মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। যে মারাঠা জাতি শিবাজীর আদর্শ এবং অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে তারা এক বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

১০. জায়গীর প্রথায় সংকট ঃ জায়গীর প্রথায় সংকট মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি প্রধান কারণ ছিল। বহু মনসবদারকে জায়গীর দিতে সম্রাটের ব্যর্থতা, লাভজনক জায়গীর না পাওয়ায় পুরাতন জায়গীরদারদের অসন্তোষ, ইজারাদার ও জায়গীরদারদের নির্মম কৃষক-শোষণ, ঘন ঘন কৃষক-বিদ্রোহ, উৎপাদন হ্রাস কিন্তু সাম্রাজ্যের ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে সম্রাটদের ঔদাসীন্য প্রভৃতি মুঘল সাম্রাজ্যকে দ্রুত পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

১১. জাতীয়তাবোধের অভাব ঃ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সামরিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভর ছিল না। সম্রাট আকবর ভারতের সকল সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস চালান। কিন্তু সফল হতে পারেননি। মুঘল সম্রাটগণ ভারতের জনসাধারণকে এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি বলে সম্রাট আক্রান্ত হলে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য জনগণ এগিয়ে আসেনি। জাতীয়তাবোধের অভাব মুঘল সাম্রাজ্য পতনের একটি উলে- খযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচ্য।

বহিরাগত কারণ

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের মূল শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট তখনই পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের ভারত আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। নাদির শাহের এক ভূঁইফোঁড় পুত্রের সঙ্গে সম্রাট তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্মতি দিয়ে মুঘল সম্রাটের যে সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল তাও বিনষ্ট হয়। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফলে সমগ্র পৃথিবী বিশেষত ভারতবর্ষের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থানকারী ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় বণিকদের নিকট মুঘল সম্রাটের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি রাখতে শুরু করে। কাবুল ও সিন্ধুর পশ্চিমাঞ্চল নাদির শাহের অধিকারে যাওয়ায় ভারতবর্ষ দেশরক্ষার অগ্রবর্তী অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা নিরীক্ষণ করার সুবিধাজনক অবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে নাদির শাহ মণিমুক্তা সহ প্রায় ১৭ কোটি টাকার সম্পদ ভারতবর্ষ থেকে পারস্যে নিয়ে যাওয়ার ফলে মুঘল রাজকোষ একেবারে নি:শেষ হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয় চরমভাবে দেখা দেয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থাও প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। এমনি অবস্থায় আফগানিস্তানের শাসক আহমদ শাহ আবদালী নয়বার ভারত আক্রমণ করে মুঘল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আহমদ শাহ আবদালীর বারবার আক্রমণে কার্যত মুঘল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর মারাঠারা এবং সর্বশেষে ইংরেজগণ মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ফেলে।

সারসংক্ষেপ

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল যোগ্য প্রতিভাবান শাসকের। কিন্তু আওরঙ্গজেবের পর প্রতিভাবান সম্রাটের অভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অভিজাতবর্গ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া আরওরঙ্গজেব পরবর্তী সম্রাটগণ ছিলেন দুর্বল ও বিলাসপ্রিয়। তাঁদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। সর্বোপরি বৈদেশিক আক্রমণ, মুঘল রাষ্ট্র প্রজাবর্গের সমর্থনপুষ্ট না হওয়ায় এবং প্রধানত প্রশাসনিক ও সামরিক দুর্বলতার কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।

২। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।

৩। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুঘল আমলে প্রশাসন ব্যবস্থা সম্রাটের কোন গুণের ওপর নির্ভর করতো?
(ক) গণতান্ত্রিক মনোভাবের ওপর (খ) নিয়মানুবর্তিতার ওপর
(গ) ব্যক্তিগত প্রতিভা ও শাসন দক্ষতার ওপর (ঘ) মহানুভবতার ওপর।

২। কোন মুঘল সম্রাটের আমলে সাম্রাজ্য বিস্তার চরম সীমায় পৌঁছেছিল?
(ক) আকবর (খ) শাহজাহান
(গ) জাহাঙ্গীর (ঘ) আওরঙ্গজেব।

৩। ঐতিহাসিক আরভিন ও ভিনসেন্ট স্মিথ কোন ব্যবস্থাকে মুঘল সামরিক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য দায়ী করেছেন?
(ক) জায়গীরদারী (খ) মনসবদারী
(গ) জাবতি (ঘ) গাল্লাবক্স।

৪। মারাঠা জাতি কার আদর্শ অনুসরণ করতেন?
(ক) শিবাজী (খ) কবীর
(গ) নানক (ঘ) চৈতন্য।

৫। পারস্যের কোন শাসক ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?
(ক) আহমদ শাহ আবদালী (খ) নাসির শাহ
(গ) নাদির শাহ (ঘ) মোহাম্মদ শাহ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল আমলে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার ফলাফল কি হয়েছিল?

২। মুঘল সামরিক বাহিনীর দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করুন।

৩। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি কি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী? আপনার মতামত দিন।

৪। দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম কারণ– এর সপক্ষে যুক্তি দিন।

৫। মুঘল সাম্রাজ্য পতনে বহিরাগত কারণের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

২। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (গ)।
পাঠ-২ ঃ ১। (খ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (খ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (ক) ; ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (খ); ৫। (গ)।
পাঠ-৪ ঃ ১। (ক); ২। (গ); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (খ)।
পাঠ-৫ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (ঘ); ৪। (ঘ); ৫। (খ)।
পাঠ-৬ ঃ ১। (ঘ); ২। (খ); ৩। (ক); ৪। (খ); ৫। (ক)।
পাঠ-৭ ঃ ১। (ক); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (খ)।
পাঠ-৮ ঃ ১। (গ); ২। (ঘ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ)।